5 মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

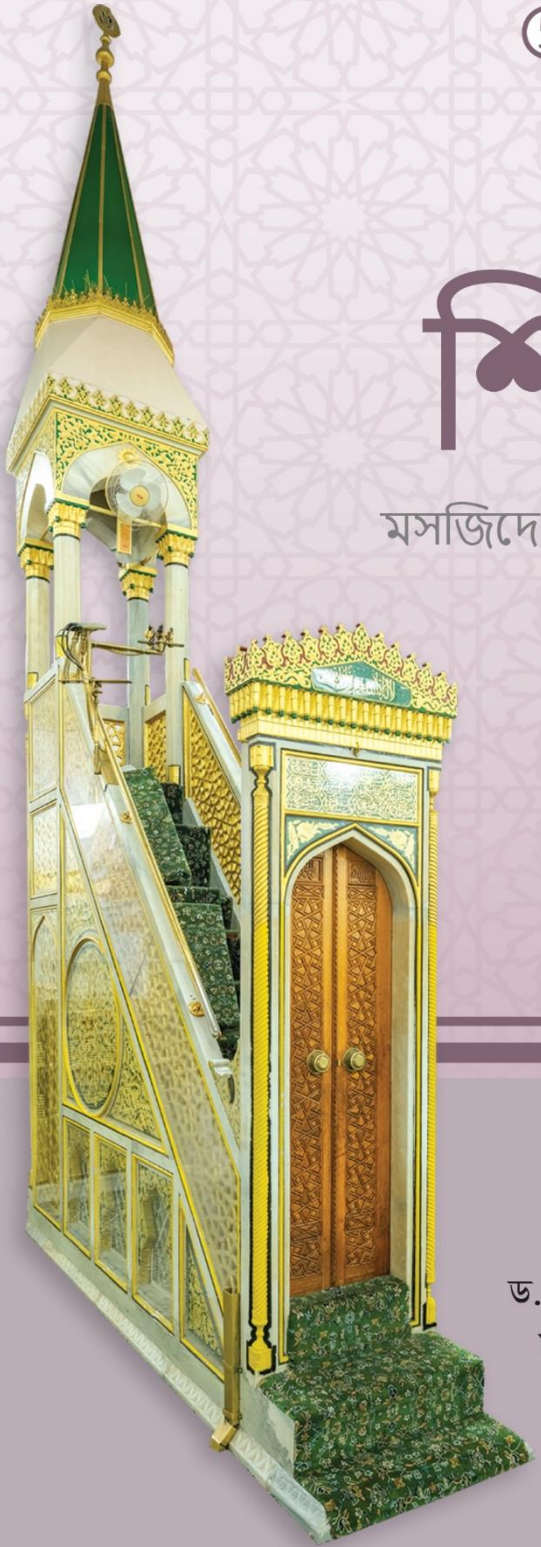

শিষ্টাচার

মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

প্রণয়ন

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

مترجم بالبنغالية

শিষ্টাচার

মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

কিতাবটি ডাউনলোড করতে বারকোডটি স্ক্যান করুন

a-alqasim.com

শিষ্টাচার

মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

প্রণয়ন:

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

ইমাম ও খতীব, মসজিদে নববী শরীফ, মদীনা মুনাওয়ারা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

অতঃপর: বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি তাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের আমলের সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তারা সুউচ্চ জান্নাত লাভ করতে পারে। এগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত রয়েছে যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে সীমাবদ্ধ। যেমন: তাকে মা'বূদ হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁর জন্য বিনয়ী হওয়া, এককভাবে তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সকল দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতাকে সাব্যস্ত করা।

আরো কিছু ইবাদত রয়েছে যা বান্দা ও সৃষ্টিকুলের সাথে সম্পর্কিত। সেগুলোর সমষ্টি হচ্ছে: উত্তম চরিত্র, কল্যাণ সাধন, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, হাসিমুখে থাকা ইত্যাদি।

সচ্চরিত্র সম্পর্কিত ইবাদতকে প্রকাশ্যে আনতে সে সম্পর্কে মসজিদে নববীতে আমি কিছু খুতবা প্রদান করেছি। অতঃপর সেগুলো আলাদাভাবে কিতাব আকারে বিন্যাস করেছি। তার সংখ্যা ১৩ টি। নাম দিয়েছি: **"শিষ্টাচার; মসজিদে নববীর খুতবা থেকে নির্বাচিত"**।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তা দ্বারা উপকৃত করেন, তাঁর সম্মানিত সত্ত্বার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

ড. আবদুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ কাসেম

ইমাম ও খতীব, মসজিদে নববী শরীফ

প্রশংসিত শিষ্টাচারসমূহ

জিহ্বার সংরক্ষণ[1]

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحْدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

আম্মা বা'দ[2]:

হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করুন। কেননা যে তার রবকে ভয় করবে, সে নাজাত পাবে। যে তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হে মুসলিমগণ! বান্দার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত অগণিত।

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾

"তোমাদের কাছে যে নেয়ামত আছে তা সব আল্লাহর পক্ষ থেকে"। (সূরা নাহাল: ৫৩) জিহ্বা একটি মহান নেয়ামত এবং আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, যা দিয়ে তিনি মানুষকে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾

আমি কি তাকে দু'টো চোখ দিইনি? আর একটা জিহবা আর দু'টো

---

[1] . খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ৪ ঠা রজব, ১৪৪১ হিজরী, মসজিদে নববী।

[2] . আম্মা বা'দ শব্দটি আরবদের নিকট একটি প্রসিদ্ধ শব্দ, যা বক্তব্য বা চিঠির সূচনায় অথবা এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার সময় ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে: অতঃপর।

ঠোঁট”? (সূরা বালাদ: ৮-৯) এতেই আছে বানী আদমের ইলম, বয়ান ও সম্মান। আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ ۞ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ۞خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ﴾

“পরম দয়ালু (আল্লাহ), তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই শিখিয়েছেন মনের কথা প্রকাশ করতে”। (সূরা আর-রহমান: ১-৪)

মানুষ যে কথাই বলে, তা তার আমলনামায় সংরক্ষিত থাকে। তা নিয়েই সে কিয়ামত দিবসে রবের সাথে সাক্ষাত করবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

“যে কথাই মানুষ উচ্চারণ করে (তা সংরক্ষণের জন্য) তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী আছে”। (সূরা ক্বাফ: ১৮) এজন্য আল্লাহ বান্দাকে সঠিক কথা বলতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا﴾

"হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল”। (সূরা আহযাব: ৭০) অনুরূপভাবে তিনি আদেশ করেছেন, পবিত্রতম সর্বোত্তম কথা বলতে। তিনি বলেন,

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾

“আমার বান্দাদেরকে বলতে বল এমন কথা যা উত্তম”। (বানী ইসরাঈল: ৫৩)

ঈমানদার ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে: কল্যাণজনক কথার মধ্যে

জিহ্বাকে সীমাবদ্ধ রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে লোক আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) যারা আজেবাজে কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ﴾

"আর যারা অসার কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলে"। (সূরা মুমেনূন: ৩)

প্রকৃত মুসলিম তার জিহ্বাকে সংরক্ষণ করে। এটা সংরক্ষণের মধ্যেই বান্দাদের মর্যাদায় তারতম্য হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সর্বোত্তম মুসলিম কে?' তিনি বললেন, সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।' (বুখারী ও মুসলিম) জিহ্বা সংরক্ষণের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই উরুর মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর সংরক্ষণের অঙ্গীকার আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হয়ে যাবো"। (বুখারী)

জিহ্বা একটি ছোট্ট বস্তু, অনেক উপকারী, কিন্তু তার ক্ষতিও অনেক বেশী হতে পারে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহ্বার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই"। (আবু দাউদ)

এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের ব্যাপারে এর অনিষ্টতার ভয় করেছেন। সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেনঃ এই যে,

এটি। (তিরমিযী)

এই ভয় নিয়েই সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবন চালিয়েছেন। আবু বাকর (রাঃ) স্বীয় জিহ্বা বের করে বললেন, "এই জিহ্বাই তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে"। ইবনে আব্বাস (রা.) নিজের জিহ্বা ধরে বলেন, "আফসোস তোমার জন্য! ভালো কথা বলো, তাহলে লাভবান হবে, নতুবা চুপ থাকো, তাহলে নিরাপদ থাকবে। অন্যথা জেনে রাখো নিশ্চিত তুমি লজ্জিত হবে"।

দুনিয়া ও আখেরাতে জিহ্বার বিপদ বিরাট। কত ঘটনা এরকম ঘটেছে, একটি মাত্র কথার কারণে জাতির জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "জিহ্বার চেয়ে এমন কোন বস্তু নাই যাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্দি করে রাখা প্রয়োজন"। কখনো মুখের কথা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে নি:স্ব অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা কি বলতে পার প্রকৃত অভাবী কে? তাঁরা বললেন, আমাদের মাঝে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও ধন-সম্পদ নেই সে তো অভাবী লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে প্রকৃত অভাবী লোক, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সলাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে ও আরেকজনকে প্রহার করেছে। এরপর সে ব্যক্তিকে তার নেক 'আমল থেকে দেয়া হবে, অমুককে তার নেক 'আমল থেকে দেয়া হবে। এরপর যদি পাওনাদারের দাবী পূরণ করার আগেই তার নেক 'আমল শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী) "মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করেই এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘটে, এর ফলে সে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে দোযখে গিয়ে পতিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

জিহ্বার সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে: আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দুয়া করা এবং তাকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করা। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ﴾

"তার চেয়ে অধিক গুমরাহ কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না, আর তাদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও তারা বেখবর"? (সূরা আহকাফ: ৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন শরিকের কাছে দুয়া করেছে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (বুখারী)

আল্লাহই একক অনুগ্রহকারী। নেয়ামত বা অনুগ্রহকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে নেসবত করা একটি শিরক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে"।

(বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ভয় ও দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছু অর্জন হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقٗا﴾

"আরো এই যে, কতক মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে"। (সূরা জ্বিন: ৬)

কথাবার্তার শির্কের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করবে, সে কুফরী করবে অথবা শিরক করবে"। (আহমাদ) তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিধর্মী হওয়ার কসম করবে তাহলে সে যা বলবে তাই হয়ে যাবে"। (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমানতের কসম করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়"। (আবু দাউদ)

তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। কোন মানুষ যদি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম দ্বারা নিজের নামকরণ করে, তবে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত নাম ঐ ব্যক্তির, যার নাম 'মালিকুল আমলাক' (মহারাজ রাজাধিরাজ) রাখা হয়। "আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ মালিক ও অধিপতি নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

সবকিছুর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর নিকট। শাব্দিকভাবে বা অর্থগতভাবে আল্লাহর ইচ্ছাকে কারো ইচ্ছার সমকক্ষ বানানো যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা বলো না যে, আল্লাহ যা চান এবং অমুক লোক যা চায়। কিন্তু তোমরা বলো, আল্লাহ

যা চান, অতঃপর অমুকে যা চায়”। (আহমাদ)

তক্বদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এর প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম একটি রুকন। অতএব এরূপ বলো না যে, “যদি আমি এমন এমন করতাম তবে এমন হত না। বরং এ কথা বলো যে, আল্লাহ তা‘আলা যা নিদিষ্ট করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা (لَوْ/যদি) শব্দটি শয়তানের কর্মের দুয়ার খুলে দেয়”। (মুসলিম) কথার মাধ্যমে তক্বদীরের উপর বিরক্তি প্রকাশ করা জাহেলি যুগের কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “মৃতের জন্য বিলাপ করে ক্রন্দনকারীনী যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে ক্বিয়ামাতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তার গায়ে থাকবে আলকাতরা তথা জ্বলন্ত জামা এবং পাঁচড়াযুক্ত চাদর”। (মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা রাত-দিনকে পরিবর্তন করেন এবং পরিচালনা করেন। যুগ বা সময়কে গালি দেয়া ঈমানের পরিপন্থী ও তাকে দুর্বলকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি”। (বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর কুধারণা পোষণ করে এবং মানুষকে তাঁর করুণা থেকে নিরাশ করে, সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন করে। বানী ইসরাঈলের জনৈক আবেদ ব্যক্তি তাদের মধ্যকার অপরাধী লোকটিকে বলেছিল: “আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অমুক লোককে মাফ করবেন না। আর আল্লাহ তা’আলা বলেন, সে লোক কে? যে শপথ খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে মাফ করব না? আমি তাকে মাফ করে দিলাম এবং তোমার আমলগুলো বিনষ্ট করে দিলাম”। (মুসলিম) আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, “লোকটি এমন একটি কথা বলেছে, যার দ্বারা নিজের

দুনিয়া ও আখেরাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন লোক যদি বলে 'মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে' তাহলে সেই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত"। (মুসলিম)

অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই আছে। তিনি বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾

"বলুন, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" (সূরা নামল: ৬৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে লোক গণকের নিকট গেল এবং তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করল, চল্লিশ রাত্রি তার কোন সলাত গ্রহনযোগ্য হবে না"। (মুসলিম) তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট আসল এবং তার বলা কথার প্রতি বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল'। (আহমাদ)

সবচেয়ে বড় হারাম হচ্ছে: বিনা ইলমে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলা। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾

"বল, 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায়, বিরোধিতা, আল্লাহর অংশীদার স্থির করা যে ব্যাপারে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি, আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন"। (সূরা আ'রাফ: ৩৩)

দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ

বলেন,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ * لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ﴾

‘বল, আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়োনা, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ”। (সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬)

মিথ্যা জঘন্যতম পাপ, অশ্লীল ত্রুটি এবং সমস্ত মন্দের মূল। মিথ্যা হচ্ছে মুনাফিকির অন্যতম লক্ষণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়”। (বুখারী ও মুসলিম) নিকৃষ্ট মিথ্যা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যচার করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسۡوَدَّةٌۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لِّلۡمُتَكَبِّرِينَ﴾

“যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে ক্বিয়ামতের দিনে তুমি তাদের মুখগুলো কালো দেখতে পাবে. অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নামে নয়”? (যুমার: ৬০)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিবে”। (বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি স্মরণ থাকা অবস্থায় অতিত কোন বিষয়ে মিথ্যা কসম

করে, তাহলে তাকে বলা হয় 'ইয়ামিনে গুমূস'। এরকম কসমকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি বিনা অধিকারে কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা কসম করবে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এ অবস্থায় যে তিনি তার উপর রাগান্বিত থাকবেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

বংশের ব্যাপারে মিথ্যা দাবী করাও একটি মিথ্যা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন লোক যদি নিজ পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবী করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন সম্প্রদায়ের লোক বলে দাবী করল, অথচ তাদের সাথে কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল"। (বুখারী ও মুসিলম)

কাবীরা গুনাহ হচ্ছে: মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শির্‌ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম হচ্ছে: অপর মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা, সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং ইজ্জত নষ্ট করা"। (মুসলিম) অনুরূপভাবে "পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কাবীর গুনাহ। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দিতে

পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয় প্রত্যুত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। কেউ বা অন্যের মাকে গালি দেয় জবাবে সেও তার মাকে গালি দেয়”। (বুখারী ও মুসলিম)

একটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ হচ্ছে: বিবাহিত সতী মুমিন নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾

“যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরল ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত আর তাদের জন্য আছে গুরুতর শাস্তি”। (সূরা নূর: ২৩)

মিথ্যা অপবাদ হল: নিরাপরাধ মানুষের উপর এমন দোষ চাপানো যা সে করেনি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾

“যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি কিংবা পাপ করে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, সে তো অপবাদ এবং সুস্পষ্ট গুনাহ নিজের উপর চাপিয়ে নেয়”। (সূরা নিসা: ১১২)

আর গীবত হল: “তোমার মুসলিম ভাই অপছন্দ করে তার এমন দোষের কথা (তার অসাক্ষাতে) উল্লেখ করা”। (মুসলিম) এটি কাবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا﴾

“তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে”? (সূরা হুজুরাত: ১২) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, “মৃত প্রাণী খাওয়া যেমন আল্লাহ হারাম করেছেন, অনুরূপ গীবতকেও হারাম করেছেন”।

জিহ্বার একটি বিপদ হচ্ছে: মানুষের মাঝে চুগোলখোরি করা: আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ * هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ﴾

“তুমি তার অনুসরণ কর না, যে বেশি বেশি কসম খায় আর যে লাঞ্ছিত। যে পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়”। (সূরা কলম: ১০-১১)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। (বুখারী ও মুসলিম) ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর (রহ.) বলেন, “চুগোলখোর একজনের কথা অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মাঝে সম্পর্কের যে ফাটল তৈরী করে, একজন যাদুকর তা এক বছরেও করতে পারে না”।

“কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ”। (বুখারী ও মুসলিম) “একজন অপর জনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন অন্যজনকে যেন কাফির বলে অপবাদ না দেয়। কেননা যদি সে তা না হয়ে থাকে তবে কথাটা তার উপরই পতিত হবে”। (বুখারী) মু’মিন ব্যক্তি তিরস্কারকারী, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। (আহমাদ) লা’নত বা অভিসম্পাতকারীরা সাক্ষী হতে পারে না এবং কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারীও হতে পারবে না। (মুসলিম)

মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা ঠাট্টা করা এক প্রকার অহংকার। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একজন মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে"। (মুসলিম) আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾

হে মু'মিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নাম কতই না মন্দ! (এ সব হতে) যারা তাওবা করে না তারাই যালিম। (সূরা হুজুরাত: ১১)

"জাহেলিয়াতের কাজ হচ্ছে: নিজের বংশ নিয়ে গর্ব করা এবং অন্যের বংশকে নিন্দা করা"। (ত্বাবরানী)

ইসলাম যেমন জীবিতদেরকে গালিগালাজ হারাম করেছে, অনুরূপ মৃতদেরকেও গালি দিতে নিষেধ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে"। (বুখারী) এমনকি ইসলাম বাতাস, জ্বর এবং পশু-প্রাণীকেও গালি দিতে নিষেধ করেছে।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করবে, সে আল্লাহর গোপন পর্দাকে ফাঁস করে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের সবাইকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু যারা প্রকাশ্যে অপরাধে লিপ্ত হয়, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

একজন মুসলিম দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করবে। খোঁটা দিলে দান বাতিল হয়ে যায়। কিয়ামত দিবসে খোঁটাদানকারীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না।

মানুষের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করা নিষেধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ভিক্ষাবৃত্তি করতেই থাকে, তাহলে কিয়ামত দিবসে সে আল্লাহর সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার মুখমন্ডলে কোন গোস্তের টুকরাও থাকবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

কেউ যদি বাতিল নিয়ে বিতর্ক করে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হল সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়া ও বিতর্কে লিপ্ত থাকে"। (মুসলিম)

নিজের ঘরের প্রাইভেসি সংরক্ষণ করার মধ্যেই আছে নিরাপত্তা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, তারপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়"। (মুসলিম)

অতিরিক্ত কথা পদস্খলনের কারণ। আল্লাহ আমাদের জন্য অনর্থক কথাবার্তা নিয়ে বাদানুবাদ করাকে অপছন্দ করেছেন"। (বুখারী ও মুসলিম) "অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলামের পরিচয়।" (আহমাদ) সাহল বিন আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, "যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে কথা বলে যাতে তার কোন প্রয়োজন নেই, সে সত্যবাদিতা থেকে বঞ্চিত হবে"। নববী (রহ.) বলেন, "প্রত্যেক

প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের উপর আবশ্যক হচ্ছে, কল্যাণ প্রকাশ পায় এমন বিষয় ব্যতীত সবধরণের কাথাবার্তা থেকে নিজের জিহ্বাকে হেফাজত করা"।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ:

জিহ্বাকে সংযত করা এবং রক্ষা করাই হচ্ছে সকল কল্যাণের মূল। যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বার উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে, সে তার সকল বিষয়কে কন্ট্রোল ও মজবুত করতে পারবে। "যে নিরব থাকে সে মুক্তি পায়" (আহমাদ) মানুষ যতক্ষণ চুপ থাকে নিরাপদ থাকে। কথা বললেই তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে লিপিবদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি কাজের চেয়ে কথার হিসাব রাখতে পারে, তার অপ্রয়োজনীয় কথাও কমে যায়।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম[1]

﴿لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴾

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শের (কথাবার্তার) মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত অথবা কোন সৎকাজের কিংবা লোকেদের মধ্যে মিলমিশের নির্দেশ দেয়। যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে এ কাজগুলো করবে, আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব"। (সূরা নিসা: ১১৪)

[1] অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه تسليماً مزيداً.

হে মুসলিমগণ!

কল্যাণের দরজা অসংখ্য-অগণিত। যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে সংরক্ষণ করতে পারবে, সে সকল প্রকার কল্যাণের মালিক হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়াজ (রা.)কে বলেন, "আমি কি তোমাকে বলব না, এ সকল কল্যাণের মালিক কে? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর নবী। তখন তিনি তার জিহ্বা ধরে বললেন: এটিকে সংযত রাখ। আমি বললাম: হে আল্লাহ্‌র নবী, আমরা যে কথাবর্তা বলি সেই কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন: "তোমাদের মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! লোকদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য এই জিহ্বার কামাই ছাড়া আর কিছু আছে নাকি"? (আহমাদ)

মানুষের সবচেয়ে ছোট্ট দুটি অঙ্গ জিহ্বা ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও কলুষতার উপর নির্ভর করে তার ভালো ও খারাপ হওয়া। বান্দার ঈমান সঠিক হবে না, যতক্ষণ তার অন্তর সঠিক না হবে। আর তার অন্তর সঠিক হবে না, যতক্ষণ তার জিহ্বা সঠিক না হবে।

অন্তরগুলো হাঁড়ির মত, ভিতরে যা আছে তা নিয়ে ফুটতে থাকে। জিহ্বা হচ্ছে: বড় চামচ। মানুষ কথা বললেই তার জিহ্বা অন্তরের ভিতরের বস্তু চামচের মত বের করে নিয়ে আসে। অতএব আপনি ভিতরে কল্যাণ লুকিয়ে রাখুন, আপনার জিহ্বা কল্যাণ বের করে আনবে।

অতপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে। ...

সততা[1]

الحمدُ للَّه الذي خَلَقَ الإنسانَ من طينٍ، وجَعَلَهُ بقُدْرَتِه في قرارٍ مَكِين، أَحْمَدُه تعالى حَمْدَ الشَّاكرين. وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، المَلِك الحقّ المُبين. وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، الصَّادقُ الأمين، أصدقُ النَّاس قولاً، وأخلصُهم عملاً، وأوفاهم عهداً، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه مصابيحِ الهُدَى وأعلامِ الدِّين.

অতঃপর,

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। সবচেয়ে মজবুত হাতল হচ্ছে তাক্বওয়া । এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আল্লাহর নির্দেশনা। এটাই বিচার দিবসে নাজাতের পথ।

হে মুসলিমগণ!

নিশ্চয় আল্লাহর মানুষকে দুর্বলতা থেকে সৃষ্টি করেছেন। শূন্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। সকল মাখলুকের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। উচ্চারণ ও বয়ান করার বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। শব্দ দ্বারা মানুষ নিজের উদ্দেশ্যকে পেশ করে থাকে, হৃদয়ের লুকায়িত কথা প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বা হীনতা প্রকাশ পায়। উচ্চাকাংখা ও শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। যে হক ও সত্য কথা বলবে সে উচ্চ সম্মান লাভ করবে এবং নাজাত পাবে। আর যে বাতিল কথা বলবে সে ধ্বংস হবে এবং দুর্ভাগা হবে।

[1] . খুতবার তারিখ: শুক্রবার, ১৬ ই রবিউল আওয়াল, ১৪১৯ হি:, মসজিদে নববী।

নিশ্চয় মানবিক শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক মহৎ গুণ হচ্ছে: জিহ্বা দ্বারা সত্য কথা উচ্চারণ করা। এটাই সম্মানজনক জীবনের মূল বিষয় এবং সৌভাগ্যশীল সমাজ ও জাতি গঠনের মূল ভিত্তি।

মহান আল্লাহ সততা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। এটাকেই নির্ধারণ করেছেন ওহীর বাহক ও রিসালতের প্রচারকদের চরিত্র হিসেবে। মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেন,

﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا﴾

“আর কিতাবে উল্লেখিত ইবরাহীমের কথা স্মরণ করো, নিশ্চয় সে ছিল সত্যবাদী নবী”। (সূরা মারইয়াম: ৪১) তিনি ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে বলেন,

﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا﴾

“আর কিতাবে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা স্মরণ কর, সে ছিল ওয়াদা রক্ষায় সত্যবাদী, আর ছিল একজন রসূল ও নবী”। (সূরা মারইয়াম: ৫৪)

আদর্শ পুরুষরা সততার গুণে সজ্জিত হয়, অনুগত মুমিনরা তা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়, যাদের রূহগুলো পঙ্কিলতা থেকে পরিস্কার হয়েছে, হৃদয়গুলো বক্রতা থেকে পবিত্র হয়েছে এবং আত্মাগুলো প্রত্যেক হীন ও তুচ্ছতা থেকে উচ্চ হয়েছে।

সততা জাতির সৌভাগ্য ও আভ্যন্তরীণ সচ্ছতার পরিচায়ক। এটাই সকল কল্যাণের উৎস। মুহাম্মাদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “সত্যকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য, কেননা সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করলে ও

সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়”। (বুখারী ও মুসলিম)

ঝগড়া-বিবাদ বেশী হলে সততাই হচ্ছে ফায়সালাকারী। অধিকার নষ্ট হলে সততা তার স্বাক্ষী। কথাবার্তায় অস্পষ্টতা দেখা দিলে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সমস্যা হলে সততা হচ্ছে তার আলোকবর্তিকা।

হে মুসলমানগণ!

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সততার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। কেননা এটাই উত্তম চরিত্রের প্রথম বিষয়, সেদিকে আহ্বানকারী। এই গুণের অধিকারীর উচ্চমর্যদা সম্পন্ন হওয়ার জন্য এটা এক লক্ষণ। এর মাধ্যমেই বান্দা নেককারদের স্তরে উন্নীত হতে পারবে, সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া সকল বরকত আছে এই সততার সাথেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়”। (বুখারী ও মুসলিম) এ জন্য যে ব্যক্তি লেনদেনে সত্যবাদী, আপনি দেখতে পাবেন তার জীবিকা প্রচুর, তার জীবন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে তার অবস্থান।

সত্যবাদীর কথায় শত্রু-মিত্র সবাই আশ্বস্থ থাকে। সে মানুষের সম্পদ, অধিকার ও গোপনীয় বিষয়ে বিশ্বস্থ থাকে। কখনো বিপত্তি বা হোঁচট খেলে তার সততা গৃহীত সুপারিশকারী হয়। মিথ্যুককে অণু পরিমাণ বিশ্বাস করা যায় না। কখনো যদি সে সত্য বলেও সেটার প্রতি কর্ণপাত করা হয় না। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ

(আ.)এর ভাইদের ব্যাপারে কি বলেছেন, যখন তারা তাদের পিতাকে বলেছিল:

﴿ٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا وَمَا كُنَّا لِلۡغَيۡبِ حَٰفِظِينَ ٨١ وَسۡـَٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلۡعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقۡبَلۡنَا فِيهَاۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ٨٢ قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ جَمِيلٌۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًا﴾

“তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও, গিয়ে বল, ‘হে আমাদের পিতা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যেটুকু জানি তারই চাক্ষুষ বিবরণ দিচ্ছি, চোখের আড়ালের ঘটনা তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা যে জনপদে ছিলাম তার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করুন আর যে কাফেলার সঙ্গে আমরা এসেছি তাদেরকেও, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। ইয়াকুব বলল, ‘না, বরং তোমরা নিজেরাই একটা কাহিনী সাজিয়ে নিয়ে এসেছ, কাজেই ধৈর্য ধারণই আমার জন্য শ্রেয়, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে একত্রে আমার কাছে এনে দেবেন।’’ (সূরা ইউসুফ: ৮১-৮৩) তাদের এই সত্য কথা প্রথমবারের মিথ্যার কারণে বাতিল হয়ে গেছে। যখন ইউসুফের ব্যাপারে তারা বলেছিল: ﴿فَأَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُ﴾ “তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে”। (ইউসুফ: ১৭)

অতএব একজন মুসিলমের উপর আবশ্যক হচ্ছে, সৃষ্টি জগতে নিজের মর্যাদাকে অনুভব করা, দুনিয়ায় তার অবস্থানকে অনুধাবন করা এবং সুমহান চরিত্র দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করা। এই কারণে কথা বললে সত্য বলবে, লেনদেন করলে স্বচ্ছতার সাথে করবে। আমানত রাখা হলে যথাস্থানে তা পৌঁছে দেবে, অঙ্গীকার করলে পূরণ করবে।

সততার অভাব ও মিথ্যার ছড়াছড়ি বড়ই বিপজ্জনক। এটা যদি

সমাজে ছড়িয়ে যায়, তবে তার নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেঙ্গে পড়বে। স্থিতিশীলতার ভিত্তি ধ্বসে পড়বে। সমাজের সবার প্রশান্তিগুলো পেরেশানীতে পরিবর্তিত হবে এবং সুখ-শান্তিগুলো দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে।

যে সমাজের সদস্যরা মিথ্যার চর্চা করে সেই সমাজে জীবন দুর্বিষহ।

মুসলিম জাতির অগ্রগতি, মঙ্গল এবং সবার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি; এটি নির্ভর করে সদস্যদের সবার মধ্যে সততার প্রসারের উপর।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তুবাদ আজ কিছু মুসলিমকে মোহিত করে ফেলেছে, ফলে এ জীবনে তার অবস্থান কি তা ভুলে গেছে এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলেছে। যার ফলে মিথ্যা ও অবাস্তব আশায় ঘৃণ্য চরিত্র গ্রহণ করেছে এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির স্বভাবকে আপন বানিয়ে নিয়েছে।

সুমহান কুরআন সেই লোকদের আচরণের প্রতিবাদ করেছে যারা ধারণা ও খেয়ালের পিছে দৌড়ায়। যারা নিজেদের বিবেককে কুসংস্কার দিয়ে ভরে দিয়েছে। মিথ্যা ও লৌকিকতা দ্বারা নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহর বলেন,

﴿وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا﴾

“অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করছে, আর প্রকৃত সত্যের মুকাবেলায় অনুমান কোনই কাজে আসে না”। (সূরা নজম: ২৮)

নিশ্চয় সত্যবাদীর সাক্ষ্য নেক, তার বিচার ন্যায়সঙ্গত এবং তার আচরণ কল্যাণকর। যে ব্যক্তি নিজের কাজ-কর্মে সততা অবলম্বন করে, সে রিয়া ও শ্রুতি থেকে দূরে থাকতে পারে। তার সালাত, যাকাত,

সিয়াম, হজ্জ এবং ইলম ও দাওয়াত এক আল্লাহর জন্য হয়- যার কোন শরীক নেই। সে ইহসান বা মানুষের প্রতি করুণা দ্বারা ধোঁকা বা প্রতারণার কোন উদ্দেশ্য রাখে না। সৃষ্টির কারো নিকট থেকে প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা অনুসন্ধান করে না। তার কথা ও কাজের সততা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কথার সাথে কাজের সত্যতা পাওয়া যায়।

হে মুসলিমগণ!

মহান আল্লাহ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় ও জ্ঞানের অধিকারী সকল গোষ্ঠীকে সত্যবাদী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উলামাগণ দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবীদের উত্তরাধিকারী। কথা ও কাজে সত্যানুসন্ধানী হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ। দ্বীনের যে জ্ঞান তারা বহন করেন ও প্রচার করেন সে অনুযায়ী আমল করে থাকেন।

﴿وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾

“বরং ‘তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হও; যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং নিজেরাও তা পাঠ কর”। (সূরা আল ইমরান: ৭৯)

একজন ব্যবসায়ী বরকত লাভের আশা করলে তার উপর আবশ্যক হয়ে যায় সত্যকে অনুসন্ধান করা। তাই সে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে নিজের পণ্যকে বাজারজাত করবে না। কেননা মিথ্যা উপার্জনকে নষ্ট করে দেয়, লাভের বরকতকে মিটিয়ে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম”। (ইবনে মাজাহ)

তাদের এই অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণ বারবার মিথ্যাচারিতা করা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় মিথ্যা পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়"। (বুখারী ও মুসলিম)

বিভিন্ন স্তর ও পদের কর্মচারীদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, তারাও সততা অনুসন্ধান করবে। তারা যেন এমন কিছু দাবী না করে বাস্তবতা যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং বাস্তবতাও তাকে বিশ্বাস করে না। মানুষের আকাঙ্খা যত উঁচু হবে, প্রভাব যত বিস্তৃত হবে এবং দায়িত্ব বিভিন্ন রকমের হবে, ততই সততা অবলম্বন তার জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

সকল বিষয়ে সততাকে আঁকড়ে ধরা, সকল ক্ষেত্রে তা অনুসন্ধান করা এবং প্রত্যেক ফায়সালায় সততা অবলম্বন করা মুসলিম চরিত্রের একটি শক্ত স্তম্ভ। ঈমানের মূল হচ্ছে সততা। আর মুনাফেকীর মূল হচ্ছে মিথ্যা। আল্লাহ জানিয়েছেন যে, কিয়ামত দিবসে সততা ব্যতীত বান্দাকে কোন কিছু উপকার করতে পারবে না এবং তাঁর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহর বলেন,

﴿هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡۚ﴾

"এটা এমন দিবস যখন সত্যবাদীর সততাই শুধু উপকারে আসবে"। (সূরা মায়েদা: ১১৯)

তাই কথায়, ইচ্ছা ও নিয়তে, কর্মে এবং লেনদেনে সততা অবলম্বন করতে হবে।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি তাঁর কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করেন, তাঁর প্রবেশ ও বের হওয়া যেন সততার উপর হয়। আল্লাহর বলেন,

﴿وَقُل رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا﴾

“বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে (যেখানেই) প্রবেশ করাও, (সেটা কর) সত্য ও সম্মানের প্রবেশ, আর আমাকে (যেখান হতেই) বের কর, (সেটা কর) সত্য ও সম্মানের বহির্গমন, আর তোমার নিকট হতে আমাকে এক সাহায্যকারী শক্তি দান কর”। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৮০) আর ইবরাহীম খলীল (আ.)এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَٱجۡعَل لِّي لِسَانَ صِدۡقٖ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ﴾

“এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করো”। (সূরা শুআরা: ৮৪) তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ﴾

“আর যারা ঈমান আনে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে উচ্চ মর্যাদা”। (ইউনুস: ২)

﴿إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَنَهَرٖ * فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٖ مُّقۡتَدِرِۭ﴾

“নিশ্চয় মুত্তাক্বীরা থাকবে বাগান আর ঝর্ণাধারার মাঝে, প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী (আল্লাহ)’র নিকটে”। (সূরা কামার: ৫৪-৫৫)

এখানে পাঁচটি বিষয়: প্রবেশ করা, বের হওয়া, জিহ্বা, পা এবং

মর্যাদার স্থান। এই বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে দৃঢ় সত্য যা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, আল্লাহর দিকে পৌঁছে দেয়। এগুলোর মধ্যে যে কথা ও কাজ আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর জন্য।

এই সঠিক নীতির উপরই প্রথম যুগের লোকেরা তথা সালফে সালেহীন (রা.) চলেছেন। তারা সততা দিয়ে অন্ধকারে আলো জ্বালিয়েছেন। তারা ছিলেন জাতির জন্য আলোকবর্তিকা। কা'ব বিন মালেক (রা.) তাবুক যুদ্ধে অংশ না নিয়ে পিছনে থাকার বিষয়ে সত্য বলেছিলেন। যে তিনজন পিছনে থেকে ছিলেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। এদের জন্য তখন পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের আত্মাও সংকুচিত হয়ে উঠেছিল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, "তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, "না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।" আমি বললাম যে, "হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তওবার দাবী যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব।" কা'ব (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আর আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ তাআলা আমাকে এ থেকে নিরাপদ রাখবেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও”। (সূরা তাওবা: ১১৯)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মাধ্যমে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمدُ للَّه ربِّ البَرِيَّات، عَالِمِ الخَفيَّات، المُطَّلِعِ على الضَّمائرِ والنِّيَّات، أَحْمَدُه سبحانه على ما خصَّنا به من جلائلِ النِّعَم، وأَشْكُرُه تعالى على ما حَبَانا به من أنواع الجودِ والكَرَم.

وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلام. وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، خيرُ مُرْسَلٍ وأكملُ إمامٍ، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً على الدَّوام.

অতঃপর:

হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। জেনে রাখুন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কালাম। সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হেদায়াত। সাবধান ইবাদতে নতুন উদ্ভাবন করবে না। কেননা প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনকৃত ইবাদতই হচ্ছে বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। আপনারা মুসলিমদের জামআতকে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। কেননা মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধতায় রয়েছে আল্লাহর সাহায্য। যারা তাদের দল থেকে বের হয়ে যাবে, সে জাহান্নামে পতিত হবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

নিশ্চয় ইসলাম ন্যায়পরায়ণতা ও সংস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত ও প্রশংসিত বৃক্ষ রোপণ করে। পাশাপাশি ইসলাম লড়াই করে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধেও। কেননা এগুলো হচ্ছে পদস্খলন ও চরিত্রগত

নীচুতার কারণ। এর অগ্রভাগে রয়েছে: মিথ্যা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ত্রুটি ও হীন কাজ হচ্ছে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে না, তারাই মিথ্যে রচনা করে আর তারাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী"। (সূরা নাহাল: ১০৫) মিথ্যাকে আল্লাহ তায়ালা মূর্তির সাথে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ﴾

"কাজেই তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা বর্জন কর আর মিথ্যে কথা পরিহার কর"। (সূরা হজ্জ: ৩০)

কিছু মানুষ এমন আছে যারা মনে করে বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম কর্মের অন্যতম রং হলো মিথ্যা বলা। বরং মনে করে এটা যোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট। কিভাবে তা হতে পারে? এটা তো নিছক একটি হীন কাজ। এর ভিত্তি হচ্ছে পাপ ও এটাই হচ্ছে সকল অকল্যাণের মূল। মিথ্যা ব্যক্তির অন্তরে দুর্নীতির অনুপ্রবেশকে প্রমাণ করে। মিথ্যা হচ্ছে কাপুরুষতা এবং দুর্বলতার লক্ষণ এবং মুনাফেকির একটি অন্যতম আলামত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে সত্যিকার মুনাফিক; যার মধ্যে উক্ত চারটির একটিও থাকে সে তা না ছাড়া পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব রয়ে যায়। (১) আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) চুক্তি করলে ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়া করলে গালাগালি করে"। (বুখারী ও মুসলিম) মুসিলমের বর্ণনায় আছে: "যদিও সে সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে এবং দাবী করে যে সে মুসলিম"।

আল্লাহু আকবার! এই মিথ্যার কারণে কত অধিকার নষ্ট হয়েছে, কত নিষিদ্ধতাকে লঙ্ঘণ করা হয়েছে। এই মিথ্যা কত সম্পর্ককে নষ্ট করেছে, শত্রুতাকে উস্কে দিয়েছে। মিথ্যাবাদী তার মিথ্যার চাতুরতা দিয়ে একটা সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, তার কল্পনা ও ধারণাপ্রসূত অমূলক মিথ্যার কারণে কত সমাবেশকে বিভক্ত করে দিতে পারে।

আমলের বিনষ্ট ও অধিকার নষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মিথ্যা। এটি মানুষের মর্যাদাকে অবমাননা করে, মানুষের সম্মান হরণ করে। এটি একটি জঘন্য পাপ এবং অনৈতিক ত্রুটি, লাঞ্ছনা, খারাপ স্বভাব এবং দুর্বল ধর্ম। যার পরিচয় এত জঘণ্য তার অধিকারীকে কিভাবে বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে?

মিথ্যাবাদী আদেশ করলে তা লঙ্ঘণ করতে হবে, নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধে চলতে হবে। আল্লাহর বলেন,

﴿فَلَا تُطِعِ ٱلۡمُكَذِّبِينَ﴾

“তুমি মিথ্যাবাদীর অনুসরণ করো না”। (সূরা কলম: ৮) মিথ্যাবাদী কাছে আসলে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে, দূরে থাকলে তার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতে হবে। তার নি:শ্বাস বিষাক্ত, তার অন্তর কয়লাযুক্ত। যে ব্যক্তি সত্যবাদিতা থেকে দূরে থাকবে সে মিথ্যা ও ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে পতিত হবে।

হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন, কথায় ও কাজে সততা অবলম্বন করুন; তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ লাভে বিজয়ী হবেন।

অত:পর জেনে রাখুন! আল্লাহর আপনাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার।...

কৃতজ্ঞতা[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর:

হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা আল্লাহভীতি হচ্ছে অন্তরের আলো এবং প্রত্যাবর্তন স্থল তথা কিয়ামতের দিনের জন্য সঞ্চিত সম্পদ।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে উদারভাবে বিশাল নেয়ামত দান করেছেন এবং প্রচুর পরিমাণে প্রদান করেছেন তাঁর অপার অনুগ্রহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তাআলার হাত পরিপূর্ণ। রাতদিন অনবরত খরচেও তা কমবে না"। (বুখারী ও মুসলিম) তিনি রিযিক বন্টন করেন, প্রচুর পরিমাণে দান করেন। যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। যেমন তিনি বান্দাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন তেমনি নেয়ামত-অনুগ্রহ দিয়েও পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন,

﴿وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةٗۖ وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ﴾

"আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করি। আমার

[1] . জুমআর খুতবা: শুক্রবার, ২৩ শে শাওয়াল, ১৪২৩ হি:। মসজিদে নববী।

কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে"। (সূরা আম্বিয়া: ৩৫)

আল্লাহ সকল প্রকার নেয়ামত প্রদানকারী। ভালো অবস্থার পরীক্ষা মন্দ অবস্থার পরীক্ষার চেয়ে অধিক কঠিন। এ ধরণের পরীক্ষায় পতিত ব্যক্তির দরকার ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। অভাব ও ধনাঢ্যতা হচ্ছে পরীক্ষা ও ফেতনার দুটি বাহন। বান্দার জন্য আবশ্যক হচ্ছেপালনকর্তার আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর ফায়সালা ও তাক্বদীরে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাবলম্বন করা। উভয়টির ভিত্তি হচ্ছে তাক্বওয়া। আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতাকে ঈমানের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ﴾

"তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর আর ঈমান আন তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন"? (সূরা নিসা: ১৪৭)

আল্লাহ জানিয়েছেন যে, কৃতজ্ঞতাই হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি ও নির্দেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শোনার শক্তি, দেখার শক্তি আর অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পার"। (সূরা নাহাল: ৭৮) আর তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায়ের মধ্যেই রেখেছেন তাঁর সন্তুষ্টি। তিনি বলেন,

﴿وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ﴾

"তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা করো, তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন"। (সূরা যুমার: ৭) আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিনকে, চিন্তা ও

কৃতজ্ঞতা করার জন্য। আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورًا﴾

“আর তিনিই রাত আর দিনকে করেছেন পরস্পরের অনুগামী তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়”। (ফুরক্বান: ৬২) তিনি তাঁর বান্দাদের দুভাগে ভাগ করেছেন: কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ। তিনি বলেন,

﴿إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

“আমি তাকে রাস্তা দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, অথবা অকৃতজ্ঞ হবে”। (সূরা ইনসান: ৩)

আল্লাহ জানিয়েছেন যে, যারা তাঁর কৃতজ্ঞতা করে তারাই মূলত তাঁর ইবাদত করে। যারা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, তারা ইবাদতকারীদের মধ্যে শামিল হতে পারে না। পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বপ্রথম যাকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে তিনি কৃতজ্ঞতাকারী ছিলেন বলে আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٍۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدًا شَكُورًا﴾

“(তোমরা তো) তাদের সন্তান যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় বহন করিয়েছিলাম, সে ছিল এক শুকরগুজার বান্দা”। (বানী ইসরাঈল: ৩) তিনি আদেশ করেছেন মূসা (আ.)কে নবুওয়াত, রিসালাত ও তার সাথে আল্লাহর কথা বলার নেয়ামত লাভ করে যেন তাঁর শুকরিয়া করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِى وَبِكَلَٰمِى فَخُذۡ مَآ ءَاتَيۡتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾

“তিনি বললেন, ‘হে মূসা! আমি আমার রিসালাত (যা তোমাকে

দিয়েছি) ও আমার বাক্য (যা তোমার সঙ্গে বলেছিলাম তার) দ্বারা সকল লোকের মধ্য থেকে তোমাকে নির্বাচিত করেছি। কাজেই যা তোমাকে দিয়েছি তা গ্রহণ কর আর শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও"। (সূরা আ'রাফ: ১৪৪) প্রশংসা করেছেন ইবরাহীম খলীল (আ.)এর, তিনি ছিলেন আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়াকারী। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۞ شَاكِرٗا لِّأَنۡعُمِهِۚ﴾

"ইবরাহীম ছিল আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত একনিষ্ঠ এক উম্মাত, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি ছিলেন তাঁর নেয়ামতের শোকরগুজার"। (সূরা নাহাল: ১২০-১২১) আল্লাহ তায়ালা দাউদ পরিবারকে তাঁরই কৃতজ্ঞতার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ﴾

"হে দাউদ পরিবার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমরা আমল করে যাও"। (সূরা সাবা: ১৩) সুলাইমান (আ.) পালনকর্তার কাছে দুয়া করেছেন তিনি যেন শুকরকারীদের মধ্যে শামিল হতে পারেন।

﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আর আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত দান করেছ তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর"। (সূরা আহকাফ: ১৫) আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেও শুকরিয়া করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾

"বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের মধ্যে শামিল

হয়ে যাও”। (সূরা যুমার: ৬৬) আল্লাহ তায়ালা লোকমানকেও কৃতজ্ঞতার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا لُقۡمَٰنَ ٱلۡحِكۡمَةَ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِلَّهِۚ﴾

“আমি লোকমানকে হিকমত প্রদান করেছি যে তুমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করো”। (সূরা লোকমান: ১২)

মানুষের প্রতি পালনকর্তার প্রথম ওসীয়ত ছিল যে সে আল্লাহর ও নিজের পিতা-মাতার শুকরিয়া করবে। তিনি বলেন,

﴿أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ﴾

“আমার শুকরিয়া করো এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া করো। আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে”। (সূরা লোকমান: ১৪) নবীগণও তাদের জাতিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের হুকুম দিতেন। ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছেন,

﴿فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥٓۖ﴾

“তোমরা আল্লাহ কাছে রিযিক অনুসন্ধান করো, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা আদায় করো”। (সূরা আনকাবূত: ১৭) নিদর্শনাবলী ও শিক্ষামূলক বিষয় থেকে শুধু কৃতজ্ঞরাই উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَشۡكُرُونَ﴾

“এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা কৃতজ্ঞ হয়। (সূরা আ’রাফ: ৫৮) তিনি প্রচুর পরিমাণে আমাদেরকে নেয়ামত দিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তিনি বলেন,

﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

"তিনি তোমাদেরকে পবিত্র বস্তু থেকে রিযিক দান করেছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া করতে পারো"। (সূরা আনফাল: ২৬) এ বিষয়েই ওসীয়ত করেছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবীদেরকে। তিনি বলেন, হে মু'আয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। হে মু'আয! আমি তোমাকে ওসিয়াত করছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এ দু'আটি কখনো পরিহার করবে নাঃ (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) "আল্লাহুম্মা আঈন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" (অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন)। (আবু দাউদ)

আল্লাহর নেয়ামতরাজী পূর্ণাঙ্গরূপে দান করার জন্য রবের কাছে বান্দার কৃতজ্ঞতা সহকারে আবেদন সর্বোত্তম দুয়াগুলোর একটি। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বলেন, আমি চিন্তা করে দেখলাম সর্বোত্তম দুয়া হচ্ছে: (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) (অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদাতে আমাকে সাহায্য করুন) বান্দাদের মধ্যে যারা কৃতজ্ঞতাকারী তারাই বিশেষভাবে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। তারা ফেতনার সময় বিচলিত হয় না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَنقَلِبۡ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيۡـٔٗاۗ وَسَيَجۡزِي ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾

"আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন"। (সূরা আল ইমরান: ১৪৪) আল্লাহর শত্রু ইবলিস যখন কৃতজ্ঞতার মর্যাদা সম্পর্কে জেনেছে যে, এটা সবচেয়ে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন

ইবাদত, তখন মানুষকে অকৃতজ্ঞ বানানোকেই সে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই সে বলেছে,

﴿ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ﴾

"তারপর (পথভ্রষ্ট করার জন্য) অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। ফলে আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না'। (সূরা আ'রাফ: ১৭)

আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাঁর রবের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। অথচ তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, যবের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি, ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। আল্লাহ তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন তারপরও তিনি রাতের বেলায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, এমনকি তার পদযুগল ফুলে উঠতো। আর তিনি বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞপরায়ন বান্দা হবো না"? (বুখারী ও মুসলিম)

দাউদ (আ.) "রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়াতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন। তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন"। (বুখারী ও মুসলিম) আর আল্লাহ তাকে বলেন,

﴿ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ﴾

"হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমরা আমল করে যাও"। (সূরা সাবা: ১৩)

শাস্তি থেকে বাঁচার নিরাপত্তা হচ্ছে শুকরিয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ﴾

"তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা কর আর ঈমান আন তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন"? (সূরা নিসা: ১৪৭) কৃতজ্ঞতার কারণেই আল্লাহর তায়ালা লূত (আ.)কে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٖۖ نَّجَّيۡنَٰهُم بِسَحَرٖ ۞ نِّعۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَاۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي مَن شَكَرَ﴾

আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম প্রস্তরবর্ষী প্রচন্ড বাতাস, (যা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল) লূতের পরিবারকে বাদ দিয়ে। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ধার করে নিয়েছিলাম। আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহস্বরূপ; এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেই যে কৃতজ্ঞ হয়"। (সূরা ক্বামার: ৩৪-৩৫)

সাবা সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর নেয়ামতকে অবজ্ঞা করেছিল এবং তা অস্বীকার করেছিল বরং তার বিপরীতে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছিল, তখন তিনি তা তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি আস্বাদন করিয়েছেন। আল্লাহ তাদের বিষয় উল্লেখ করে বলেন,

﴿فَأَعۡرَضُواْ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ ٱلۡعَرِمِ وَبَدَّلۡنَٰهُم بِجَنَّتَيۡهِمۡ جَنَّتَيۡنِ ذَوَاتَيۡ أُكُلٍ خَمۡطٖ وَأَثۡلٖ وَشَيۡءٖ مِّن سِدۡرٖ قَلِيلٖ ۞ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِمَا كَفَرُواْۖ وَهَلۡ نُجَٰزِيٓ إِلَّا ٱلۡكَفُورَ﴾

"কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। কাজেই আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা, আর আমি তাদের বাগান দু'টিকে পরিবর্তিত করে দিলাম এমন দু'টি বাগানে যাতে জন্মিত বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ আর

কিছু কুল গাছ। অকৃতজ্ঞতাভরে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আমি অকৃতজ্ঞদের ছাড়া এমন শাস্তি কাউকে দেই না"। (সূরা সাবা: ১৬-১৭)

সূরা ক্বলমে উল্লেখিত বাগানের মালিকরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতিদান দিয়েছিল অস্বীকৃতি ও মিসকীনদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে। এই কারণে তাদের ফসলের উপর এক বিপর্যয় নেমে আসল, ফলে তা রাতের অন্ধকারের মত ধুলিকণায় পরিণত হয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। ফুযাযইল বিন এয়ায (রহ.) বলেন, "তোমরা সর্বদা নেয়ামতের শুকরিয়া করতে থাকো। কেননা কোন নেয়ামত অপসারণ হয়ে গেলে খুব কমই তা আবার ফিরে আসে"।

আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞদের সংখ্যা সৃষ্টির মধ্যে খুবই কম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾

"আমার বান্দাদের মধ্যে শুকরগোজার লোকের সংখ্যা কম"। (সূরা সাবা: ১৩) যে সকল নেয়ামত আল্লাহর নিকটবর্তী করে না, সেটা মূলত শাস্তি। কৃতজ্ঞতা উপস্থিত নেয়ামতকে হেফাযত করে এবং হারানো নেয়ামতকে আনয়ন করে। আলী বিন আবী তালেব (রা.) বলেন, "নেয়ামত কৃতজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত। আর কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক হচ্ছে প্রবৃদ্ধির সাথে। নেয়ামতের প্রবৃদ্ধি আল্লাহর নিকট থেকে কখনো বন্ধ হয় না, যতক্ষণ না কৃতজ্ঞতা বন্ধ হয়"।

কোন বান্দার যদি আল্লাহর কাছে কোন মর্যাদা থাকে, আর সে তা সংরক্ষণ করে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারপর তিনি তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তার চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। কিন্তু সে যদি কৃতজ্ঞতা বর্জন করে, তবে

আল্লাহ তাকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবেন। হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, "নেয়ামতকে ভোগ করার জন্য আল্লাহ যা ইচ্ছা সুযোগ প্রদান করেন, কিন্তু যদি তার শুকরিয়া না করা হয়, তখন তাকে শাস্তি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন"। তুমি যদি দেখতে পাও যে, রবের নাফরমানী সত্ত্বেও তিনি তোমাকে নেয়ামত দিতেই আছেন, তবে সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহ বলেন,

﴿سَنَسۡتَدۡرِجُهُم مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ﴾

"আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতে পারবে না।"। (সূরা কলম: ৪৪) সুফিয়ান (রহ.) বলেন, "অর্থাৎ তিনি তাদেরকে পূর্ণরূপে নেয়ামত দিবেন, কিন্তু শুকরিয়া থেকে বিরত রাখবেন"।

যাকে শুকরিয়া করার তাওফীক দেয়া হয়েছে, তাকে বেশী দেয়ার অঙ্গিকার করা হয়েছে।

﴿وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ﴾

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন"। (সূরা ইবরাহীম: ৭) আবু কেলাবা (রহ.) বলেন, "তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে দুনিয়া তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না"। মহান আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে যারা তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া করে না, তাদের তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ﴾

“বস্তুতঃ মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ”। (আদিয়াত: ৬)

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾

“জনপদগুলোর লোকেরা যদি ঈমান আনত আর তাক্বওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান আর যমীনের বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দিতাম”। (সূরা আ’রাফ: ৯৬) আল্লাহর শুকরিয়া হতে হবে অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। অন্তরের কৃতজ্ঞতা হচ্ছে: নেয়ামতসমূহকে তার স্রষ্টা আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ﴾

“যে নেয়মাতই তোমরা পেয়েছ তা তো আল্লাহর নিকট হতেই”। (সূরা নাহাল: ৫৩) আর জিহ্বা বা কথার মাধ্যমে শুকরিয়ার নিয়ম হলো, তা প্রদানকারীর প্রশংসা করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহর প্রশংসা) মীযানের পাল্লাকে ভরে দেয়”। (মুসলিম) আল্লাহর প্রশংসা হচ্ছে কৃতজ্ঞতার মূল এবং প্রথম বিষয়। এ জন্য আল্লাহর কিতাবের প্রথম আয়াত হচ্ছে এটিই:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা”। (সূরা ফাতিহা: ১) আল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর নেয়ামতরাজীর বর্ণনা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ﴾

"আর তোমার রবের নেয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাক"। (সূরা দ্বোহা: ১১)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা শুকরিয়া হচ্ছে: সেগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজে ব্যবহার করা এবং তাঁর নাফরমানী ও অসন্তুষ্টিমূলক কাজে ব্যবহার না করা। যেমন চোখের শুকরিয়া হচ্ছে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা না দেখা। অতএব হারামের দিকে দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করবে না। জিহ্বার শুকরিয়া হচ্ছে হক কথা ছাড়া অন্য কিছু না বলা, সত্য ব্যতীত অন্য কিছু উচ্চারণ না করা। কানের শুকরিয়া হচ্ছে তা দ্বারা গীবত, অপবাদ, হারাম ইত্যাদি কিছু শুনবে না।

আল্লাহ পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা করতে বলেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ﴾

"আমার এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা করো"। (লোকমান: ১৪) পিতামাতার শুকরিয়া হচ্ছে তাদের সাথে সদাচরণ করা ও তাদের প্রতি ইহসান করা। তাদের জন্য দুয়া করা, তাদের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য নরম ও স্নেহশীল আচরণ করা। তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহুকে প্রসারিত করা। অন্যতম বড় গুনাহ হচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, তাদের নির্দেশকে অবজ্ঞা করা বা দু:খ প্রদানমূলক কথা বলা, তাদের আনুগত্যকে ভারী মনে করে পিছিয়ে থাকা। সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ নেয়ামতসমূহকে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া ও পরকালের কল্যাণে পৌঁছানোর উপকারণ হিসেবে ব্যবহার করে। আর দুর্ভাগা মানুষ সেগুলোকে নিজের প্রবৃত্তি ও স্বাদ-আহ্লাদে ব্যবহার করে।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ﴾

“তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না”। (সূরা নমল: ৭৩)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

অতঃপর।

হে মুসলিমগণ!

আমাদের পালনকর্তা কৃতজ্ঞতার গুণে গুণান্বিত। সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার গুণ অর্জন করতে পারবে সে তাঁর নিকট অধিক পছন্দের মানুষ হবে। তাঁর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত লোক যে কৃতজ্ঞতাকে বর্জন করে এবং তার বিপরীত কাজ করে। আল্লাহ কৃতজ্ঞ, তিনি কৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন। সৃষ্টির কেউ যদি আপনার কল্যাণ করে, তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো মূলত: আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা করে না"। (আহমাদ)

আপনি কারো কোন কল্যাণ করলে তার কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অপেক্ষা করবেন না। এটার প্রতিদান আল্লাহর কাছে কামনা করবেন। আল্লাহ আপনাকে যে রিযিক দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ হতে পারবেন। অধিকহারে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবেন। কেননা এটা অন্যতম সম্মানিত ইবাদত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "পানাহার করে কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ধৈর্যসহকারে সিয়াম পালনকারীর সমান প্রতিদানের অধিকারী"। (মুস্তাদরাক হাকেম) যে ব্যক্তি অল্পতে কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে বেশী পেলেও কৃতজ্ঞতা করবে

না। আবুল মুগীরা (রহ.)কে যখন বলা হতো কি অবস্থায় সকাল করেছেন? তিনি বলতেন, "আমরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রাচুর্যের মধ্যে সকাল করেছি, কিন্তু তার সঠিক শুকরিয়া করতে অপারগ"। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতরাজী গণনা কর, তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না"। (সূরা নাহাল: ১৮) মানুষের মধ্যে কাউকে নিরাপত্তা ও শান্তি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়; সে কেমন শুকরিয়া আদায় করে তা দেখার জন্য। আবার কাউকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়; তার ধৈর্য কেমন তা দেখার জন্য।

অতএব হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে আল্লাহভীতি অর্জন করুন, তাহলে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুজার মানুষে পরিণত হতে পারবেন।

অতঃপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

উত্তম চরিত্র[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর:

হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন এবং সুদৃঢ় রজ্জুর মাধ্যমে ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তাঁর শরীয়তে বান্দাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত ও নৈকট্যদানকারী আমল নির্ধারণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে এমন একটি ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন যা পালনকর্তার নিকটবর্তী করে দিবে এবং কিয়ামত দিবসে মীযানের পাল্লাকে ভারী করে দিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না"। (তিরমিযী) ইবাদতটি মর্যাদাকে উন্নীত করে এবং তার সোয়াবকেও বৃদ্ধি করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "অবশ্যই মুমিন তার সচ্চরিত্রের কারণে দিনে (নফল) রোযাদার এবং রাতে (নফল) ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে"। (আহমাদ) সচ্চরিত্রের কাজ সামান্য পরিমাণ হলেও তার প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করে

---

[1] . খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ১৩ জুমাদা উলা, ১৪৩০ হি:, মসজিদে নববী।

দেয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি হোক সেটা (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা"। (মুসলিম) সচ্চরিত্রবান মুমিনই সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের মাঝে সেই লোক সর্বোত্তম, যে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী"। (বুখারী ও মুসলিম) এটাই মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, "কোন আমল মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র"। (তিরমিযী) এর মাধ্যমেই মুমিনের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী"। (আহমাদ) এই বৈশিষ্টের অধিকারী ব্যক্তিকে পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি গৃহের জিম্মাদার হয়ে যাবো, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করে"। (আবু দাউদ) ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "দ্বীন হচ্ছে: সচ্চরিত্রতা। সচ্চরিত্রের দিক দিয়ে কেউ যদি তোমার চেয়ে উচ্চতায় পৌঁছে যায়, তাহলে দ্বীনদারীতায়ও সে উচ্চতায় পৌঁছে যাবে"। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের মধ্যে তাঁর পালনকর্তার কাছে সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য আবেদন জানাতেন। তিনি দুয়ায় বলতেন: "আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না এবং মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে দুরে নিন। মন্দ চরিত্রগুলো আপনি ব্যতীত কেউ আমার থেকে সরাতে পারে না"। (মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলতেন, "হে আল্লাহ আপনি আমার আকৃতিকে সুন্দর করেছেন, তাই আমার চরিত্রকেও সুন্দর বানিয়ে দিন"। (আহমাদ) ইবনে রজব

(রহ.) বলেন, "উত্তম চরিত্র ছাড়া তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) পূর্ণতা লাভ করে না"।

কিয়ামত দিবসে নবী-রাসূলদের মর্যাদার সর্বাধিক নিকটবর্তী থাকবে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারীরা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও ব্যবহার সবচেয়ে ভাল সে ব্যক্তি আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে সে আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে"। (তিরমিযী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে এটারই নির্দেশ দিতেন। তিনি মুয়ায (রা.)কে লক্ষ্য করে বললেন, "যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে; মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেককাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে। আর মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে"। (তিরমিযী) আল্লাহর দয়ায় এটা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা অগ্নি থেকে বেঁচে থাক। যদি তা না পাও তবে অন্তত একটি ভাল কথার বিনিময়ে হলেও"। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালো নৈতিকতার প্রতি আহ্বান করার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি"। (আহমাদ) নবী-রাসূলগণ সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বছর ধৈর্যসহকারে তার জাতিকে আল্লাহর পথে আহব্বান করেছেন। ইবরাহীম (আ.) ছিলেন উদার ও দানশীল। একদা তার নিকট দুজন মেহমান হাযির হন। তিনি তাদেরকে পেয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে একটি মোটাতাজা বাছুর যবেহ করে ভূনা করে নিয়ে আসেন।

ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যবাদী। ইউসুফ (আ.)কে যাদের কারণে দেশ ত্যাগ ও জেলে থাকতে হয়েছিল তাদেরকে বলেছেন,

﴿قَالَ لَا تَثۡرِيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَۖ﴾

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই"। (সূরা ইউসুফ: ৯২) মূসা (আলাইহিস সালাম) "অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। তার দেহের কোন অংশ খোলা দেখা যেত না, তা থেকে তিনি লজ্জাবোধ করতেন"। (বুখারী ও মুসলিম) ঈসা (আ.) ছিলেন মাতার প্রতি সাদাচরণকারী।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান মানুষ। আল্লাহ তার চরিত্রের বিবরণ দিয়ে বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾

"নিশ্চয় তুমি সুমহান চরিত্রের অধিকারী"। (সূরা কলম: ৪) তিনি পালিত হয়েছেন এবং জীবন কাটিয়েছেন প্রত্যেক সম্মানিত নৈতিকতার সাথে এবং দূরে থেকেছেন সবধরণের নিন্দিত গুণাবলী ও কার্যাবলী থেকে। জনৈক লোক তাকে বললেন, হে সৃষ্টির সেরা! তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিনয়ের সাথে বললেন, তিনি হচ্ছেন: ইবরাহীম (আ.)। (মুসলিম)

তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদার ও দানশীল ছিলেন। কোন আবদেনকারীকে ফেরত দিতেন না, তাদের সামনে হাস্যোজ্জ্বল মুখে থাকতেন। জারীর (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আমার সামনে মুচকী হাসি ছাড়া দেখিনি"। (বুখারী ও মুসলিম) তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্থ। সাহাবীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তিনি তার সুশ্রূষা করতেন। দেখতে না পেলে তার

খোঁজ-খবর নিতেন। অন্তর থেকে তাদের প্রতি ছিলেন সবচেয়ে বেশী দয়ালু। শিশুর কান্না শুনে মা কষ্ট পাবে মনে করে সালাতকে সংক্ষেপ করতেন। স্বভাব-প্রকৃতিতে সবেচেয়ে বেশী নম্র ছিলেন। গৃহে ফিরে পরিবারের বাড়ির কাজে সাহায্য করতেন। সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল ছিলেন। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন, কিন্তু কারো কাছে অভিযোগ করেননি। সবেচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল ছিলেন। শত্রুরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাকে রক্তাক্ত করেছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তাদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাদেরকে বলেছেন, "যাও তোমাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হলো"। (বায়হাকী) সবচেয়ে বেশী পূর্ণ সহনশীল ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু পাহাড়ের ফেরেশতা এসে দুটি পাহাড়ের মাঝে তাদেরকে পিশে ফেলতে চাইলে তিনি তা করতে নিষেধ করেন। তিনি আয়েশা (রা.)কে বলেন, "নম্রতা অবলম্বন করবে, কঠোরতা ও অশ্লীলতা থেকে সাবধান থাকবে"। (বুখারী ও মুসলিম) নিজের হাত দিয়ে কখনো কাউকে প্রহার করেননি, না কোন স্ত্রীকে না কোন খাদেমকে। (মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও উচ্চ নৈতিকতার এই সঠিক নীতির উপর চলেছেন সাহাবায়ে কেরাম। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে মহান নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন। উরওয়া বিন মাসউদ (রা.) তাদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'তিনি কোন আদেশ করলে তারা তার আদেশ পালনে তৎপর ছিলেন। তিনি কথা বললে তারা নিজেদের আওয়াজ তার সামনে নিচু করে নিচ্ছিল। অতি সমীহতে তার প্রতি তারা এক দৃষ্টে তাকাচ্ছিল না।' (বুখারী) আমর বিন আস (রা.) বলেন, "অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তার প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তার দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ চোখ ভরে আমি কখনোই তার প্রতি তাকাতে পারিনি'। (মুসলিম) সাহাবায়ে কেরাম

পরস্পরকে সম্মান করার ক্ষেত্রে উত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন। উমার (রা.) বলেন, 'আবু বকর আমার চেয়ে বেশী সহনশীল ও সম্মানিত ছিলেন'। আলী (রা.) বলেন, 'আবু বকর সকল কল্যাণে অগ্রগামী ছিলেন'। উসমান (রা.) এত লাজুক ছিলেন যে, ফেরেশতারাও তাকে দেখে লজ্জিত হতেন।

অত:পর হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভদ্র স্বভাবের দ্বারা বান্দা যেভাবে নিজেকে সম্মানিত করতে পারে তা অন্য কোনভাবে পারে না। সচ্চরিত্রের মূল হচ্ছে: তাওহীদ। তাওহীদ শুণ্য ব্যক্তি অন্য কোন গুণাবলী দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। আয়েশা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইবনু জুদআন- সে কুরায়শদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল- সে জাহেলী যুগে আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করত এবং দরিদ্রদের আহার দিত। আখিরাতে এসব কর্ম তার উপকারে আসবে কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "কোন উপকারে আসবে না। সে তো কোনদিন এ কথা বলেনি যে, হে আমার রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও"। (মুসলিম)

মুসলিমগণ যখন কুরআনের চরিত্র গ্রহণ করতে পারবে, সমাজ সংশোধন হবে। হতে পারবে উত্তম আদর্শ ও প্রশংসিত কর্মের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের প্রতি উত্তম দাঈ।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾

"ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সত্য-সঠিক কাজের আদেশ দাও আর জাহিলদেরকে এড়িয়ে চল"। (সূরা আ'রাফ: ১৯৯)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

হে মুসলিমগণ!

মুমিনের চরিত্র হবে: ধর্মের উপর অটলতা, নম্রতার সাথে হাসিমুখে থাকা, দয়ার সাথে ক্ষমা, দানের ক্ষেত্রে উদারতা, অভাবের সময় সন্তুষ্টি, বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করা, উত্তম কথা, সালামের প্রসার, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, প্রতিবেশীর সাথে সাদাচরণ ইত্যাদি। ইবনুল মুবারক বলেন, "উত্তম চরিত্র হচ্ছে: হাসিমুখে থাকা, উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা"।

আল্লাহর যেমন রিযিক বন্টন করেছেন তেমনি চরিত্রকেও বন্টন করেছেন। পবিত্র কুরআন সকল সম্মানিত চরিত্র ও সর্বোত্তম আমলগুলোকে একত্রিত করে বিবৃত করেছে। আয়েশা (রা.)কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "তার চরিত্র ছিল কুরআন"। (আহমাদ)

অতএব আপনারা কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান আপনাদের নবীর অনুসরণ করুন। সাহাবায়ে কেরামের নীতির উপর চলুন। চারিত্রিক বিষয়ে অন্যের জন্য নিজেদেরকে আদর্শ বা অনুকরণীয় হিসেবে গড়ে তুলুন। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য হাসিল করবেন।

অত:পর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন এবং সুদৃঢ় রজ্জুর মাধ্যমে ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসিলমগণ!

ঈমান ও সচ্চরিত্রের মাধ্যমে একজন মানুষ সুউচ্চ হয়, এ উভয়টির সমন্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা মহান হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সুউচ্চ স্থানে একটি ঘরের জিম্মাদার যে তার চরিত্রকে সুন্দর করে"। (আবু দাউদ)

সহনশীলতা সচ্চরিত্রের মূল ভিত্তি, পূর্ণ বিবেকের পরিচয় ও নিজ আত্মার উপর নিয়ন্ত্রণের দলীল। এ গুণের অধিকারী ব্যক্তি সুমহান মর্যাদা ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়। তার পরিণাম প্রশংসিত ও কর্ম সন্তোষজনক। শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন, "মানুষের কষ্টে সহনশীলতা ও ধৈর্যাবলম্বন এবং অন্যায়কে ক্ষমা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতবাসীদের সর্বোত্তম চরিত্রের পরিচয়। এর মাধ্যমে মানুষ এমন মর্যাদায় উন্নীত হতে

[1] . খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ২৪ শে সফর, ১৪৩২ হি:, মসজিদে নববী।

পারে যা নফল রোযা ও নামাযের এর মাধ্যমে পারে না"।

এটি এমন বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ পছন্দ করেন। যারা এ গুণের অধিকারী হতে পারে, তাকে তিনি মাগফিরাত ও জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ﴾

"আর নিজের ক্রোধকে সংবরণকারীরা"। (সূরা আল ইমরান: ১৩৪) ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, "অর্থাৎ তারা মানুষের উপর নিজের রাগকে প্রকাশ করে না, তাদের অনিষ্ট থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করে"।

এসব বৈশিষ্টের উপযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন: রাসূলগণ। ফুযাইল (রহ.) বলেন, "নবী-রাসূলদের চরিত্র হচ্ছে: সহনশীলতা, ধীরস্থিরতা এবং কিয়ামুল্লাইল"। মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ.)কে সহনশীল বলে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয় ইবরাহীম হচ্ছেন, সহনশীল, তাওবাকারী ও প্রত্যাবর্তনকারী"। (সূরা তাওবা: ১১৪) এমনকি তাকে সহনশীলতার বৈশিষ্টের অধিকারী সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَبَشَّرۡنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ﴾

"অত:পর আমি তাকে সহনশীল ছেলের সন্তানের সুসংবাদ দিলাম"। (সূরা সাফফাত: ১০১)

যখন নূহ (আ.) তার জাতিকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান করেছিলেন, তখন তারা অহংকারবশত: কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখতো।

এমনকি তারা তাকে বলেছে:

﴿مَجۡنُونٞ وَٱزۡدُجِرَ﴾

"পাগল এবং তাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল"। (সূরা কামার: ৯) তারপরও তিনি তাদেরকে সাড়ে নয়শত বছর ধৈর্য সহকারে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। মুসা (আ.)কে তার সম্পদ্রায়ের লোকেরা পাগল বলেছে, যাদুর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু তিনি তাদের সামনে ধৈর্য্য প্রদর্শন করে গেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهٗا﴾

"অতঃপর তারা যা বলেছিল আল্লাহ তাথেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। সে ছিল আল্লাহর নিকট সম্মানিত"। (আহযাব: ৬৯) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ব যামানার একজন নবীর কথা উল্লেখ করেন, তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন প্রহার করেছে যে তার শরীরকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। তিনি নিজের মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেছেন, "হে আমার রব, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা অজ্ঞ, জ্ঞান রাখে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তার জাতির নিকট থেকে নানা প্রকারের কষ্ট-নির্যাতন ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি আয়েশা (রা.)কে বলেন, "তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যেসব সংকটের সম্মুখীন আমি হয়েছি, তাতো হয়েছিই"। (বুখারী ও মুসলিম) পাহাড়ের ফেরেশতা এসে তাকে বলেন, "আপনি চাইলে 'আখশাবাইন' নামক দুই পাহাড়কে আমি ওদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ এদের বংশ থেকে এমন

সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না"। (বুখারী ও মুসিলম) জনৈক বেদুঈন তাকে দেখে একটি শক্ত চাদর গলায় পেঁচিয়ে এত জোরে টান দিয়েছে যে, তার গলায় দাগ পড়ে গেছে। "তারপর সে বলল: হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট আল্লাহ্‌র যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন"। (বুখারী ও মুসলিম) তার সহনশীলতা চাকর-বাকর পর্যন্তও প্রসারিত ছিল। আনাস (রা.) বলেন, "আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম কখনো তিনি আমাকে 'উফ' পর্যন্ত বলেননি"। (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবীদের মধ্যে যারা সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন, তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি আশাজ্জ আবদুল কায়সকে বলেছেন, "তোমার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা"। (মুসলিম) আবু বকর (রা.) ঈমান ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিখুঁত সাহচর্যে অন্যদের থেকে এগিয়ে ছিলেন এবং ভূষিত ছিলেন মহৎ গুণাবলীতে। সাহাবীরাও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। উমার (রা.) বলেন, "আবু বকর আমার চেয়ে সহনশীল ও অধিক মর্যাদাবান ছিলেন"।

সাহস হচ্ছে অন্তরের শক্তি ও দৃঢ়তা। ফলে অজ্ঞ মানুষের কথা ও নির্বোধ মানুষের কর্ম তাকে বিচলিত করতে পারবে না। প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সে লোক যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে। তখন যা কল্যাণজনক তাই সে করে। কিন্তু ক্রোধের সময় পরাজিত ব্যক্তিই প্রকৃত দুর্বল। যে লোক ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত করতে পারে নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রশংসা করেছেন, "কুস্তি লড়ে পরাজিত করার নাম শক্তিশালী নয়। প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে"। (বুখারী ও মুসলিম)

নির্বোধ মানুষকে সহ্য করা তার চরিত্র গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম। অজ্ঞ মানুষের সাথে বিতর্কে জড়ানোর চেয়ে তাকে এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। মূর্খ লোকের কথার জবাব না দেয়াটাই তার সঠিক জবাব এবং তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান। জনৈক ব্যক্তি যিরার বিন কা'কা' (রা.)কে বললেন, "আল্লাহর কসম, আপনি আমাকে একটি গালি দিলে, দশটি গালি শুনবেন। তখন যিরার বললেন, কিন্তু তুমি আমাকে দশটি গালি দিলে আমি একটি গালিও তোমাকে দিব না"। এক ব্যক্তি শা'বী (রহ.)কে গালি দিলে তিনি জবাবে বললেন, "তুমি আমাকে যা বলেছো আমি যদি সেরকম হই, তবে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আর যদি তেমন না হই, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন"।

যে ব্যক্তি সৃষ্টিকে ক্ষমা করবে, আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন। ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, "বান্দার গুনাহের ব্যাপারে ঠিক তেমন আচরণ করা হবে, যেমন সে মানুষের ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে করে থাকে। যেমন কর্ম তেমন ফল। সে যদি ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন। সে যদি তার প্রতি ভাইয়ের দূর্ব্যবহারকে মাফ করে দেয় আল্লাহও তার অপরাধকে মাফ করে দিবেন, যে ভ্রুক্ষেপ না করে ও ছাড় দেয় আল্লাহও তাকে ছাড় দিবেন, যে ভুল অনুসন্ধান করে বেড়াবে, আল্লাহও তার ভুলগুলো অনুসন্ধান করে বের করে ছাড়বেন"।

ক্রোধ: নৈতিকতা বিনাশকারী, আমল ধ্বংসকারী। বিবেক ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্টকারী। ইবনুল মুবারাককে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আমাদেরকে এক কথায় উত্তম চরিত্রের সংজ্ঞা পেশ করুন। তিনি

বললেন, ক্রোধ বর্জন করা"।

ক্রোধ বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এক লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে বলল, "আমাকে কিছু উপদেশ দিন, তিনি বললেন, "রাগ করো না"। লোকটি কয়েকবার প্রশ্নটি করল, প্রতিবারেই তিনি বললেন, "রাগ করো না"। (বুখারী) লোকটি বলল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ঐ কথা শোনার পর আমি গভীরভাবে চিন্তা করে যা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে: "ক্রোধই সব ধরণের অকল্যাণ আনয়ন করে"। (আহমাদ)

ক্রোধের সময় মানুষের বিবেক লোপ পায়। যার ফলে সে বাতিল কথা বলে, সত্যকে গোপন করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুয়া করতেন, "হে আল্লাহ! সন্তুষ্টি ও ক্রোধের সময় সত্য কথা বলার তাওফীক কামনা করছি তোমার কাছে"। (নাসাঈ) ক্রোধ মানুষের মাঝে মিমাংসার সময় ইনসাফকে বাধাগ্রস্ত করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোন বিচারক যেন রাগান্বিত থাকা অবস্থায় দুজন (বিবাদমান) লোকের মাঝে বিচারকার্য না করে"। (বুখারী ও মুসলিম)

অনেক সময় মানুষ ক্রোধের কারণে ধন-সম্পদও খুইয়ে থাকে। জাবির (রাযিঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বুওয়াত প্রান্তরে যুদ্ধের উদ্দেশে রওনা হলাম। তারপর এক আনসারী ব্যক্তির আরোহণের পালা আসলে সে তার উটটিকে বসিয়ে এর উপর আরোহণ করল এবং তাকে চালাল। চলমান অবস্থায় উটটি তার উপর কিছু ধূলাবালি উড়াল। ফলে সে রাগতস্বরে বলে উঠল, আল্লাহ তোমার প্রতি অভিসম্পাত করুন। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোকটি কে যে

তার উষ্ট্রের প্রতি অভিসম্পাত করল? সে বলল, আমি, হে আল্লাহর রাসূল! তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এর থেকে নেমে যাও। আর অভিশপ্ত উটটি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপর এবং নিজের ধন-সম্পদের উপরও বদদুয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এমন মুহূর্তে বদদুয়া করবে যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয় এবং তা কবুল হয়। (মুসলিম) ইবনে রজব (রহ.) "এসব থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির দুয়াও কখনো কবুল হয়ে যায়, যদি সেটা আকস্মিকভাবে দুয়া কবুলের সময়ে হয়ে থাকে। এই জন্য ক্রোধের সময় নিজের উপর পরিবারের কোন সদস্য ও নিজ সম্পদের উপর বদদুয়া করা নিষেধ"।

মানুষ যখন রেগে যায়, তখন সে এমন কথাও বলে ফেলে যা তার জানা নেই। অনেক সময় নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়- যেমন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, স্ত্রীকে ত্যাগ করা, নিজের জীবিকা ছিন্ন হওয়া, বন্ধুদের তাকে পরিত্যাগ করা, ক্রুদ্ধ হয়ে অন্যদেরকে আক্রমণ করা, অথবা তার নিকট থেকে নিষিদ্ধ কথাবার্তা প্রকাশ হওয়া যেমন: অপবাদ, অপমান, অশ্লীলতা এবং বিভিন্ন ধরণের অন্যায় ও আগ্রাসনমূলক আচরণ প্রকাশ হওয়া। এর ফেলে সৃষ্টি হয় উদ্বেগ, নি:সঙ্গতা, দুঃখ এবং একাকীত্ব ইত্যাদি। অনেক সময় রাগান্বিত অবস্থায় কৃত কর্মের কারণে দুনিয়াতে দন্ড অথবা পরকালে আযাবের সম্মুখীন হতে পারে।

যে রাগান্বিত হয় তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্রোধ দূর করার উপায় গ্রহণ করতে আদেশ দিতেন। আদেশ দিতেন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। কেননা সেই হচ্ছে সকল ক্রোধ ও শত্রুতার মূল উৎস। রাগের কারণে জনৈক লোকের

চেহারা লালবর্ণ ধারণ করেছিল, তাকে দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি এমন একটি কথা জানি, তা পাঠ করলে তার রাগ দুর হয়ে যাবে; আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম"। (বুখারী ও মুসলিম) তিনি ক্রুদ্ধ মানুষকে 'আউযুবিল্লাহ0' ব্যতীত অন্য কিছু বলতে নিষেধ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হলে সে যেন নীরব হয়ে যায়"। (আহমাদ) কাছে যদি পানি থাকে তাহলে ওযু করে নিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন ওযু করে নেয়"। (আহমাদ) আরো নির্দেশ দিয়েছেন নিজের বর্তমান অবস্থানকে পরিবর্তন করার। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যখন তোমাদের কারো রাগ বা ক্রোধ হয়, সে যেন বসে পড়ে, তাতে রাগ না কমলে সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে"। (আবু দাউদ)

আত্মার সম্মান ও উচ্চাকাঙ্খা হচ্ছে: গালিগালাজ থেকে বিরত থাকা। মূর্খদেরকে উপেক্ষা করে চলার মধ্যে রয়েছে ইজ্জত ও দ্বীনের হেফাযত। মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا﴾

"আর অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করলে তারা বলে 'সালাম'"। (সূরা ফুরকান: ৬৩)

ক্রুদ্ধ লোকের উপর আবশ্যক হচ্ছে: তার উপর আল্লাহর সহনশীলতা স্মরণ করা, তাঁর শাস্তিকে ভয় করা। মানুষের উপর আপনার ক্ষমতার চেয়ে আপনার উপর আল্লাহর ক্ষমতা অনেক বেশী। ক্রোধের

কারণে যে অনুতাপ ও আফসোসের সম্মুখীন হতে হয় তা স্মরণ করবেন। ক্রোধে আক্রান্ত হলে শত্রুতা ও প্রতিশোধের পরিণাম এবং শত্রুদের উল্লাস থেকে সাবধান থাকবেন। মুমিন সর্বদা ক্ষমার সোয়াব এবং উত্তম মার্জনাকে অনুভব করবে। দুনিয়া অনেক তুচ্ছ তাই তার জন্য রাগান্বিত হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

কোন ব্যক্তি যদি সহনশীল হতে না পারে তবে সে নিজেকে সহনশীলতার প্রতি ধাবিত করবে ও তার চর্চা করবে। আহনাফ বলেন, "আমি সহনশীল নই, কিন্তু সহনশীল হওয়ার ভান করি"। ক্রোধ যদি মানুষকে অন্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে সে বিপরীত চলার চেষ্টা করবে, নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, তাহলে ক্রোধের অনিষ্ট তার নিকট থেকে দূরে চলে যাবে।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾

"ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সত্য-সঠিক কাজের আদেশ দাও, আর জাহিল-মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল"। (আ'রাফ: ১৯৯)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمدُ للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

হে মুসলিমগণ:

যে ব্যক্তি সহনশীলতার বৃক্ষ রোপন করবে, সে তার ফল ভোগ করবে। মূলত ক্রোধের সময় সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তম মানুষ দেরীতে রাগ করে, আবার রাগ হলেও দ্রুত রাগ থেকে ফিরে আসে। আর খারাপ মানুষ হচ্ছে: যে দ্রুত রাগ করে এবং রাগ থেকে স্বাভাবিক পথে দেরীতে ফিরে আসে।

বিবেকের পূর্ণতার পরিচয় হচ্ছে: রাগ করলেও রাগ যেন তাকে বাতিল ও অন্যায়ের দিকে না নিতে পারে। আর সন্তুষ্টিও যেন তাকে হক ও সত্য থেকে বের করতে না পারে।

সাবধান তাড়াহুড়ো করবেন না, কেননা তাড়াহুড়ার কারণে অনেক সময় নিজের প্রাপ্য মিস হয়ে যায়। আর কাছের ও দূরের সব মানুষের জন্য আচরণকে সহজ ও নরম করবেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেকে মানুষের ক্রোধ থেকে বাঁচিয়ে চলে। ফলে সে কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে না, তাদের মর্যাদাহানি করে না। তাদের সম্পদ আত্মসাত করে না। গীবত, অপবাদ ও মিথ্যারোপের মাধ্যমে মানুষের ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ করে না।

অতঃপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

উদারতা-দানশীলতা[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। নিজের সত্ত্বা, গুণাবলী ও কর্মে তিনি পরিপূর্ণ। তাঁর সুন্দর নামগুলো রূপ ও সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ চুঁড়ায় পৌঁছেছে। তাঁর সর্বোচ্চ গুণাবলী উচ্চতা ও মহিমায় শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে: **আল কারীম** (মহানুভব, দানশীল) আমরা তাঁর নিকট যা চেয়েছি তিনি তা দিয়েছেন। আমরা যা চাইনি অনুগ্রহপূর্বক তাও তিনি আমাদেরকে প্রদান করেছেন। বান্দা হাত উঠিয়ে তাঁর নিকট কিছু চাইলে, তিনি তা শূন্য অবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

যে তাঁর নিকট আবেদন করে, তার জন্য তাঁর দরজা উন্মুক্ত। তাঁর জীবিকা ও ভান্ডার থেকে বান্দাদেরকে অঢেলভাবে দান করলেও তা হ্রাস পায় না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ

---

[1]. খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ৬ ই রজব, ১৪৩১ হিজরী, মসজিদে নববী।

তা'আলার হাত প্রাচুর্যে ভরপুর। রাত দিন ব্যয় করা সত্ত্বেও তা মোটেই কমে না। একটু ভেবে দেখ! আসমান জমিন সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করেছেন এতে তার হাত একটুও খালি হয়নি বা কমেনি"। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি মহানুভব, তিনি দোয়াকারীদের নিকটবর্তী। তাঁর ও বান্দাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদনের মাঝে কোন পর্দা নেই। তিনি বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

"হে নবী! আমার বন্দারা যদি তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে আমি তো তাদের নিকটেই আছি, কোন আবেদনকারী আমার কাছে আবেদন করলেই আমি তাতে সাড়া দেই"। (সূরা বাকারা: ১৮৬) তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের কামনার অধিক দিয়ে থাকেন। হাদীছে কুদসীতে আছে: "আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন পুরস্কার তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান তা শোনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তর তা কল্পনাও করেনি"। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি নিষেধ করেছেন বান্দা যখন চাইবে তখন যেন কম করে না চায়। বরং প্রার্থনার সময়ে যেন বেশি করেই চায়, কেননা তাঁর দান অফুরন্ত। অতএব আপনার প্রয়োজনের সবটুকুই তাঁর নিকট পেশ করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দুয়া করে তখন সে যেন না বলে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ (হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে মাফ করুন)। কিন্তু সে যেন দৃঢ়তার সাথে দুয়া করে। সে যেন বিশাল আগ্রহ নিয়ে দুয়া করে। (অর্থাৎ: যা ইচ্ছা তাই যেন চায়) কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দান করেন তা আল্লাহর নিকট তেমন কোন বিশাল জিনিস নয়"। (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁর কিতাব (কুরআন) মহাসম্মানিত।

﴿إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ﴾

“নিশ্চয় এটা মহাসম্মানিত কুরআন”। (সূরা ওয়াকেয়া: ৭৭)

যে একে তেলাওয়াত করবে এবং তদানুযায়ী আমল করবে, তিনি তাকে সম্মানিত করবেন।

প্রতিদানের ক্ষেত্রে অল্প আমলের বিনিময়ে অফুরন্ত সোয়াব দিয়ে থাকেন।

﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ﴾

“যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে, তাকে তার দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে”। (সূরা আনআম: ১৬০) যাকে ইচ্ছা এর চেয়ে বহুগুণ বেশি সোয়াব দিয়ে থাকেন। “যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করে না, তবু তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দেয়া হয়”। (বুখারী ও মুসলিম) দুনিয়ার ক্ষণিক জীবনে যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করে ইবাদত করবে, তাকে পরকালে স্থায়ী নেয়ামতের জান্নাত দিবেন এবং অনুগ্রহ করে তাঁর মুখমন্ডল দর্শনের সুযোগ দিবেন।

মানুষের মধ্যে মহানুভবতা একটি প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য। অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতার পরিচায়ক। শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন, “মৌলিক শ্রেষ্ঠ গুণাবলী হচ্ছে: ইলম ও দ্বীন এবং মহানুভবতা ও সাহসিকতা”। এটা কল্যাণজনক বৈশিষ্ট্য। কোন মুমিনের মধ্যে এটা থাকলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উন্নীত করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় প্রথম আগমন করেন, তখন এর প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, “হে লোক সকল! সালাম প্রসার করো, মানুষকে খাদ্য দান করো এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করো, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে”। (তিরমিযী)

এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। কিয়ামত দিবসে মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হচ্ছে উত্তম চরিত্র। হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, "উত্তম চরিত্র হচ্ছে: উদারতা ও দান। প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা নাযিল হয়: "তাদের মধ্যে একজন বলে, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন"। (বুখারী ও মুসলিম) কোন মুসলিম এই ইবাদত আদায় করতে সক্ষম হলে তাকে ঈর্ষা করা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ; (১) এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; (২) আরেক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়"। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী। তিনি জ্ঞানীদের (উলামাদের) ভালোবাসেন। তিনি উদার, উদার মানুষদের ভালোবাসেন। তিনি অনুগ্রহকারী, অনুগ্রহশীলদের পছন্দ করেন। উদারতা পুরুষদের পরিচয় এবং নেক লোকদের বৈশিষ্ট্য। মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে উদার হচ্ছেন আল্লাহর নবীগণ। ইবরাহীম (আ.)এর নিকট মানুষের আকৃতিতে আল্লাহর দূতগণ আগমন করেছেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁরা ফেরেশতা ছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তমভাবে তাদের সম্মান করেন। তাদের জন্য মোটাতাজা একটি বাছুর জবাই করেন এবং গরম পাথরের উপর তা ভূনা করে দ্রুত তাদের সামনে হাযির করেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِيذٖ﴾

"অনতিবিলম্বে সে ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসলো"। (সূরা হূদ: ৬৯) তিনি মূসা (আ.)এর প্রশংসা করেছেন যে, তিনি ছিলেন সম্মানিত। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدۡ فَتَنَّا قَبۡلَهُمۡ قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ وَجَآءَهُمۡ رَسُولٞ كَرِيمٌ﴾

“তাদের পূর্বে আমি ফেরাউন জাতিকে পরীক্ষা করেছিলাম। তাদের কাছে এসেছিল এক সম্মানিত রাসূল”। (সূরা দুখান: ১৭) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলেন, “তিনি নিজে মর্যাদাবান, তিনি মর্যাদাবানের পুত্র, তিনিও মর্যাদাবানের পুত্র এবং তিনিও মর্যাদাবানের পুত্র”। (বুখারী)

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল ও সবচেয়ে উত্তম দাতা। তার আত্মা ছিল সম্মানিত, হাত ছিল উদার। কেউ কখনো তার নিকট কিছু চাইলে, তিনি না বলতেন না। জনৈক ব্যক্তি তার কাছে ছাগল চাইলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এক বিশাল ছাগলের পাল দান করে দেন। লোকটি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, কেননা মুহাম্মাদ এতো বেশি দান করেন যে, তিনি দারিদ্রতার ভয় করেন না”। (মুসলিম) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা একটি চাদর পরে ছিলেন, একজন লোক বলল, “কি সুন্দর এটি, আমাকে এটি পরিয়ে দিন, সাথে সাথে তিনি তাকে সেটা দিয়ে দিলেন”। (বুখারী) তার নিকট বিভিন্ন হাদিয়া-উপঢৌকন আসত, কিন্তু তিনি সেগুলো মানুষের মাঝে বন্টন করে দিতেন। তিনি হুনাইন যুদ্ধের পর গণীমতের সম্পদ থেকে সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে প্রথমে একশত উট, তারপর আবার একশত উট প্রদান করেন। সাফওয়ান বলে, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যা দেয়ার দিয়েছেন। তিনি আমার নিকট সবেচেয়ে অপছন্দনীয় মানুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে দান করতেই থাকলেন, এমনকি তিনি আমার নিকট সবেচেয়ে প্রিয় মানুষ হয়ে গেলেন”। (মুসলিম) বাহরাইন থেকে বিশাল সম্পদ এসেছিল- অধিকাংশ সম্পদ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট সেখান থেকেই আসতো। তিনি বললেন, "এগুলো মসজিদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও"। তখন তার নিকট আব্বাস (রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু দিন, (বদর যুদ্ধে) আমি (একাই) নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করেছি। তিনি বললেন, নাও। তখন কাপড়ে অঞ্জলি ভরে নিতে থাকলেন। তারপর উঠাতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। নিচে ছড়িয়ে পড়ে গেল। অতঃপর কাঁধের উপর উঠিয়ে রওয়ানা হলেন"। (বুখারী)

এমনকি তার নিকট এর চেয়ে বেশি থাকলেও তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহলেও আমার পছন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থাকুক। তবে এতটুকু পরিমাণ ব্যতীত, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই"। (বুখারী ও মুসলিম)

তার উদারতার কারণে সম্পদ হাতে আসার আগেই তা দিয়ে দেয়ার জন্য মানুষকে ওয়াদা দিতেন। তিনি জাবের (রা.)কে বললেন, "আমাদের নিকট যদি বাহরাইনের সম্পদ আসে, তখন সেখান থেকে তোমাকে এত এত প্রদান করবো"। (বুখারী ও মুসলিম) ইবনু রজব (রহ.) বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত বেশী পরিমাণ দান করতেন যে, কিসরা ও কায়সারের মত বাদশারাও এতো দিতে অপারগ ছিল"।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পরে সবচেয়ে উদার মানুষ ছিলেন তার অনন্য সাহাবায়ে কেরাম। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদকা করার আদেশ করলেন, তখন উমার (রা.) তার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসে হাযির হলেন। আবু বকর (রা.) নিয়ে এলেন তার সমস্ত সম্পত্তি। উসমান (রা.) একাই

‘জায়শুল উশরা’ (তাবুক যুদ্ধের বাহিনীকে) সরঞ্জাম দিয়ে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রশংসা করে বলেছেন, “আজকের পর উসমান যে আমলই করুক, তার কোন ক্ষতি হবে না”। (তিরমিযী) আবু ত্বালহা (রা.) একদা এক ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে নিজের গৃহে নিয়ে যান। তখন তার স্ত্রী বলেন, “বাড়িতে শিশুদের খাবার ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি বললেন, এই খাবারগুলোই প্রস্তুত করো এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরি ছিল তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু’জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তারা উভয়েই সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ্ তোমাদের গত রাতের কান্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা খুশী হয়েছেন”। (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে উমার (রা.)এর নিকট কোন মিসকীন নিয়ে এসে না খাওয়ানো পর্যন্ত তিনি নিজে খানা খেতেন না”।

উদারতা ও মহানুবভতা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। নিজের জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে নিজের প্রতি ইহসান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে যেন নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে শুরু করে”। (মুসলিম) স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য খরচ করাও একটি বড় খাত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, একটি দীনার তুমি ব্যয় করেছ ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য, একটি দীনার তুমি সাদাকা করেছ

মিসকীনের জন্য এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ। সাওয়াবের দিক থেকে সর্বোত্তম দীনরাটি হল যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করেছ"। (মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যতম উদারতা ও কর্তব্য পূরণ হচ্ছে: পিতা-মাতার বন্ধুদেরকে সম্মান করা। প্রতিবেশীকে সম্মান করাও ঈমানের কাজ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে"। (বুখারী ও মুসলিম) প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ হচ্ছে: তাদের বাড়িতে খাদ্য পাঠানো, নিজের পরিবারকে যা খাওয়ায় তাতে প্রতিবেশীকেও শরিক করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন তুমি তরকারি রান্না করবে তখন তাতে পানি (ঝোল) বেশি দিও এবং তোমার প্রতিবেশীকে কিছু প্রদান করো"। (মুসলিম) মেহমানের সমাদর করা উত্তম ব্যক্তিত্ব ও সম্মানজনক নৈতিকতার পরিচয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে"। (বুখারী ও মুসলিম)

কারো নিকট যদি সম্পদ না থাকে, তাহলে তার মুখের কথা যেন উত্তম ও সুন্দর হয়। কেননা উত্তম কথাও এক প্রকার বদান্যতা ও এক প্রকার দান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এক টুকরো খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি লাভ কর। যদি তা না পাও তবে একটি পবিত্র বা ভাল কথার মাধ্যমে হলেও"। (বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের বিপদ ও দুশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যমে তাদের প্রতি করুণা করাও এক প্রকার উদারতা ও দান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বলেন, "প্রত্যেক ভালো কাজই হচ্ছে সাদাকা"। (বুখারী ও মুসলিম) আলী (রা.) বলেন, "সামান্য হলেও দান করতে লজ্জা করো না, কেননা তার চেয়ে অল্পতেই বঞ্চিত হতে পারে। বেশী দান করতে ভীত হয়ো না, কেননা তোমার মর্যাদা ঐ সম্পদের চেয়ে বেশী"।

যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করা হয়, সেটা সবচেয়ে সম্মানিত। মানুষের মাঝে সেই লোক মহা সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর ইবাদত করে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের মাঝে সেই লোক আল্লাহর নিকট সবেচেয়ে বেশী সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে চলে"। (সূরা হুজুরাত: ১৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন মানুষ সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে লোক আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, সেই সবচেয়ে সম্মানিত"। (বুখারী ও মুসলিম)

অতএব আপনি অর্থ খরচের বিষয়ে উদার হোন। নিজের নফস, নিজের মর্যাদা এবং অর্থের ব্যাপারে উদার হোন। পালনকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতে আগ্রহী থাকুন; তাহলে সৌভাগ্যবান হতে পারবেন।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ﴾

"তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তার প্রতিফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না"। (সূরা বাকারা: ২৭২)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

হে মুসলিমগণ!

উদারতা হচ্ছে দোষ-ত্রুটির ঢাকনা স্বরূপ। এটা দ্বীন ইসলামের একটি সৌন্দর্য। আল্লাহর প্রতি সুধারণার দলীল। এটা অপব্যায় ও কৃপণতার মাঝামাঝি একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا﴾

“আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না; এ দু’য়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে”। (সূরা ফুরক্বান: ৬৭) প্রকৃত সম্মানিত সে যাকে আল্লাহ আনুগত্যের তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করেছেন- যদিও সে গরীব হয়। প্রকৃত লাঞ্চিত সে যাকে আল্লাহ তাঁর অবাধ্যতা দ্বারা লাঞ্চিত করেছেন- যদিও সে ধনাঢ্য মানুষ হয়। অতএব উদারতার অলংকারে নিজেকে সজ্জিত করুন, সফল হবেন এবং তোমাদের পালনকর্তার যাবতীয় কল্যাণ লাভ করবেন।

অত:পর জেনে রাখুন.. নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

অনুগ্রহের স্বীকৃতি[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন এবং সুদৃঢ় রজ্জুর মাধ্যমে ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করে মহান আল্লাহর ইবাদত ও সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ দ্বারা। তাই আল্লাহ বান্দাদের জন্য তাঁর শরীয়তে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর নীচ ও হীন বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করেছেন। অনুগ্রহের স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার পূরণ হচ্ছে সমাজ গঠনের ভিত্তি এবং জীবন সঠিকভাবে চলার মাধ্যম। এটি একটি সম্মানজনক স্বভাব ও ভদ্র আত্মার বৈশিষ্ট্য। এটা হচ্ছে: অনুগ্রহের স্বীকৃতি, কেউ তোমার উপকার করলে বা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তার জন্য সৌজন্যতা প্রকাশ করা।

যে মহান প্রতিশ্রুতি পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য তা হচ্ছে: আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি। পূরণ করার নিয়ম হচ্ছে: একমাত্র তাঁর ইবাদত

---

[1]. খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ২৫ শে মুহাররম, ১৪৩২ হি:, মসজিদে নববী।

করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ ﴾

“আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব” । (সূরা বাকারা: ৪০) এই চুক্তিকে সবচেয়ে সঠিকভাবে পূরণ করেছেন নবী-রাসূলগণ। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ﴾

“এবং ইবরাহীম, যে ছিল চুক্তি পূরণকারী”। (নাজম: ৩৭) ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, “অর্থাৎ তার জন্য যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে তিনি সবগুলোকে পূরণ করেছেন, তথা সবগুলোর প্রতি আমল করেছেন- আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক তার উপর”।

মহান প্রতিশ্রুতি পূরণের অন্যতম হচ্ছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আনুগত্য, তার নির্দেশনার অনুসরণ ও তার পদাঙ্গ অনুকরণের মধ্যে তার সাথে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক”। (হাশর: ৭)

কর্তব্য পালন ও চুক্তি পূরণ হচ্ছে সুপুরুষদের পরিচয়। এটা আত্মার উচ্চতা ও সচ্চরিত্রতার প্রমাণ বহন করে। অঙ্গীকার পূরণকারী শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন নবী-রাসূলগণ। মূসা (আ.) তার ভাইয়ের যোগ্যতা জেনেছিলেন। তাই তিনি পালনকর্তার কাছে নিবেদন করেছিলেন রেসালতের দায়িত্বে তাকেও যেন অংশীদার করা হয়। তিনি বলেছেন,

﴿وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي ۞ هَٰرُونَ أَخِي ۞ ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِي ۞ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾

“আর আমার পরিবার হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। আমার ভাই হারূনকে। তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি কর। আমার কাজে তাকে অংশীদার কর”। (সূরা ত্বাহা: ২৯-৩২)

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালনকর্তার রিসালাত পৌঁছানোর কাজে যারা তাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সাথে তার কর্তব্য পালন করেছেন। হিজরতের পূর্বে মুশরেকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কষ্ট দিতে চেয়েছিল, তখন মুতঈম বিন আদী তার পক্ষে প্রতিবাদ করে তাকে রক্ষা করেছিল। তিনি তার এই ইহসানকে স্মরণ করে বদরের যুদ্ধে কাফের বন্দীদের ব্যাপারে বলেছেন, “আজ মুতঈম ইবনু আদী যদি বেঁচে থাকত আর এসব অপবিত্র লোকদের ব্যাপারে যদি আমার নিকট সুপারিশ করত, তাহলে তার সম্মানে এদেরকে আমি (মুক্তিপণ ব্যতীতই) ছেড়ে দিতাম”। (বুখারী)

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবীদের অনুগ্রহকে স্বীকার করেছেন। আবু বকর (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবী। তিনি নিজের জান-মাল দিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সহযোগিতা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনিই তার সাহচর্য সবচেয়ে বেশী লাভ করেছেন। তার সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আমি আমার উম্মতের কাউকে যদি আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার ভাই ও আমার সাহাবী”। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসমান বিন আফফান (রা.)কে হুদায়বিয়ার ঘটনায় মক্কার কুরায়শদের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তার ফিরে আসা দেরী হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) সাহাবীদেরকে বায়আত করার নির্দেশ প্রদান করেন। লোকেরা তার কাছে বায়আত করেন। তারপর তিনি বলেন -উসমান ইসলামের যে খেদমত করেছেন তার অধিকার আদায় করার জন্য-: "নিশ্চয় উসমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনীয় কাজে গেছে"। তারপর তিনি নিজের এক হাত অপর হাতের উপর রাখেন এবং বলেন, এই হাত উসমানের পক্ষ থেকে বায়আতস্বরূপ। রাবী বলেনঃ উসমান (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতখানা লোকদের নিজেদের জন্য তাদের হাতের চাইতে বেশি উত্তম ছিল। (তিরমিযী)

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট বছর পর উহুদের শহীদদের উপর জানাযা পড়েন, যেন তিনি তাদের থেকে বিদায় নিচ্ছেন। (বুখারী ও মুসলিম) যে কৃষ্ণ দাসীটি মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার কাজ করত, নবীজী তার কবরে গিয়ে জানাযা পড়েছেন। আনসারী সাহাবীরা যখন মুহাজিদরকে সহযোগিতা করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য ও তাদের সন্তানদের জন্য দুয়া করলেন: "হে আল্লাহ! আনসারদের ক্ষমা করুন, তাদের পুত্রদেরকে এবং তাদের পুত্রদের পুত্রদেরকেও"। (মুসলিম)

সাহাবীদের মধ্যে যে কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জন্য ভালো কিছু করলে, তিনি তাকে প্রতিদান দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কোন লোক আমাদের প্রতি যে কোন ধরনের দয়া করেছে, আমরা তার প্রতিদান দিয়েছি, আবূ বকর-এর দয়া ছাড়া। তিনি আমাদের প্রতি যে দয়া করেছেন, আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামতের দিন তাকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন"। (তিরমিযী)

তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সাহাবীদের মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি ভালোবাসাকে সংরক্ষণ করতে। তিনি বলেন, "তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ

করবে না। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে, তাহলেও তাদের কারোর এক মুদ (এক অঞ্জলি) অথবা অর্ধ মুদ্দের সমান হবে না"। (সহীহ মুসলিম)

তার কর্তব্য পূরণ তার উম্মতের জন্যও প্রসারিত হয়েছে। আর তা হবে কঠিন দিন কিয়ামতের মাঠে। তিনি বলেন, "প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দুয়া ছিল যা কবুল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে সকলেই তাদের দুয়া পৃথিবীতেই করে নিয়েছে। কিন্তু আমি আমার দুয়াটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য গোপন রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ সে আল্লাহর সাথে কোন প্রকার শিরক করেনি সে ইনশাআল্লাহ আমার এ দুয়া লাভ করবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

অনুগ্রহ স্বীকৃতির এই মহান নৈতিকতার উপর চলেছেন সাহাবায়ে কেরাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে লক্ষ্য করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যার কিছু ওয়াদা অথবা ঋণ রয়েছে সে যেন (আমার) নিকট আসে। জাবের বলেন, আমি তখন দাঁড়িয়ে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন যে, বাহরাইন থেকে যদি আমাদের কাছে মাল আসে তবে তোমাকে এই, এই, এই পরিমাণ দিব। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা.) এক অঞ্জলি উঠালেন এবং বললেন, গুণে দেখো। আমি তা গুণে দেখলাম তাতে পাঁচশ' (দীনার/দিরহাম) আছে। অতঃপর তিনি বললেন, এর চেয়ে আরো দ্বিগুণ তুমি নিয়ে নাও"। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা.)এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা.) উসামা বিন যায়েদের বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করেন। অথচ এই বাহিনীর তার

বড়ই প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেছেন, "আল্লাহর কসম! আমি প্রতিটি ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা করতে দেখেছি, তা ছাড়া অন্য কিছু করবো না"। (আহমাদ)

সাহাবীগণও আবু বকর (রা.)এর মর্যাদা ও ইসলামে তার অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলীফা হিসেবে তার কাছেই বায়আত করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছেন। আর আবু বকরও উমার (রা.)এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, "আমি, আবু বকর ও উমার এসেছি; প্রবেশ করেছি আমি, আবু বকর ও উমার; বেরও হয়েছি আমি, আবু বকর ও উমার"। (মুসলিম) এই কারণে আবু বকর (রা.) তার পর খেলাফতের দায়িত্ব উমার (রা.)কেই প্রদান করেছিলেন।

পিতা-মাতার অনুগ্রহের স্বীকৃতি একটি বড় বিষয়। কেননা তারা আপনাকে আরাম দেয়ার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। আপনার নিদ্রার জন্য রাত জেগেছেন। আপনার খাদ্য জোগাড় করার জন্য পিতা অনেক পরিশ্রম করেছেন। কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে মা আপনাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। সৃষ্টির অধিকারের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অধিকারকেই আল্লাহ সর্বপ্রথম ফরয করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا﴾

"তোমার পালনকর্তা ফায়সালা করেছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৩)

পিতা-মাতার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের জন্য দুয়া করবে। বলবে:

﴿وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا﴾

“হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেমন তারা শিশুকালে আমার প্রতি দয়া করেছিলেন”। (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৪) গুনাহের কাজ ব্যতীত সব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করবে, তাদের জন্য সুন্দর কাজ করবে, তাদের মনকে খুশি করবে। তাদের প্রতি সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: যেন তারা সন্তানদের মধ্যে সঠিক আচরণ ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতার পথে চলার মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টার ফল দেখতে পায়। তাদের অবদানের স্বীকৃতির আরেকটি বিষয় হচ্ছে: তাদের মৃত্যুর পর তাদের বন্ধু/বান্ধবীদের সম্মান করা। জনৈক বেদুঈন ইবনে উমার (রা.)এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে আরোহণ কর। তিনি তাকে পাগড়ীটিও দান করলেন এবং বললেন, এটি তোমার মাথায় বেঁধে নাও। তখন তার সঙ্গীদের কেউ কেউ তাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই বেদুইনকে গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর সাওয়ার হয়ে আপনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং পাগড়ীটিও দান করলেন, যার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হল কোন ব্যক্তির পিতার ইন্তেকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। আর এই বেদুঈনের পিতা ছিলেন উমর (রাঃ) এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। (মুসলিম)

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন হচ্ছে: স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান। একটি মহান চুক্তির মাধ্যমে তারা পরস্পর মিলিত হয়েছে। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا﴾

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের নিকট থেকে (বিবাহ বন্ধনের) শক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে"। (সূরা নিসা: ২১) খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ (রা.) নিজের সম্পদ দিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। তার সাথে প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। তার মাধ্যমে তিনি সন্তান লাভ করেছেন। নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম তাকে সত্যায়ন করেছেন এবং তার প্রতি ঈমান এনেছেন। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তার অন্তরকে দৃঢ় রাখার বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করেছেন। তার সংকল্পকে মজবুত করেছেন। তার জীবনে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্ত্রী। ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, "সম্ভাব্য সকল পন্থায় তিনি তাকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী থাকতেন। তাকে রাগান্বিত করে এমন কোন আচরণ তাঁর নিকট থেকে কখনই প্রকাশ পায়নি"।

ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার অবদানকে আরো উত্তম পন্থায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার ইহসানের কৃতজ্ঞতা করেছেন। এমনকি মৃত্যুর পরও অনেক বেশী তার কথা স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন: "তার ভালোবাসা আমার অন্তরে গেঁথে দেয়া হয়েছে"। (মুসলিম) কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে মাংসের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-মাংসকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদিজা (রাঃ) এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। তিনি বলতেন, "তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল"। (বুখারী) ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এই সবের মধ্যে রয়েছে উত্তম পন্থায় চুক্তি এবং সৌহার্দ্য রক্ষার প্রমাণ। জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে সঙ্গীর সম্মান রক্ষা এবং আত্মীয়তার যত্ন নেওয়া ও তার পরিবারকে সম্মান করা।

আরেকটি কর্তব্য পালন হচ্ছে: উলামাদের ভালোবাসা, তাদেরকে

সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। কেননা তারাই হচ্ছে দ্বীন বহনকারী, রাসূলদের উত্তরাধীকার। ত্বাহাবী (রহ.) বলেন, "প্রথম যুগের সালাফ এবং তাদের পরবর্তীগণ- হাদীছ ও আছারের অনুসারী তাবেঈগন এবং ফকীহ ও গবেষক আলেমগণ- তাদের সম্পর্কে কোন আলোচনা আসলে উত্তম শব্দ ব্যবহার করতে হবে। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, "তিরিশ বছর যাবত এমন একটি রাতও অতিবাহিত করিনি, যখন আমি ইমাম শাফেঈর জন্য দুয়া ও ইস্তেগফার করিনি"।

সঙ্গী-সাথীর অবদানেরও স্বীকৃত দেয়ার নিয়ম হচ্ছে, কথা ও কাজের মাধ্যমে তার কৃতজ্ঞতা করা, তার গোপন বিষয় সংরক্ষণ করা, তার সাথে সৌহার্দ বজায় রাখা। উত্তম ভাষায় তার প্রশংসা। কষ্টকর কিছু তার কাছে পৌঁছতে না দেয়া। তার ও তার সন্তানদের জন্য নিজের বদান্যতা ব্যয় করা। যারা আপনার উপকার করেছে, তাকে প্রতিদান দিন। বস্তুগত কোন জিনিস দ্বারা প্রতিদান দিতে না পারলে অন্তত তার জন্য দুয়া করবে, কারণ এটাও তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ﴾

"উত্তম কাজের প্রতিফল উত্তম পুরস্কার ছাড়া কী হতে পারে"? (সূরা রহমান: ৬০)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

হে মুসলিমগণ!

অনুগ্রহের স্বীকৃতি মূলত: কথা ও কাজের সততার প্রমাণ। যে ব্যক্তি এই স্বীকৃতি প্রদান করে তার অন্তরে সীমাহীন ঈর্ষা ও আনন্দ তৈরী হয়। অনুরূপভাবে যার অনুগ্রহকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে তার অন্তরেও সৎকাজ ও পুরস্কার প্রাপ্ত কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে। যে ব্যক্তি উপকারকে অস্বীকার করে, তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানের আগ্রহ তুচ্ছ। আপনার দান ও উদারতা প্রভৃতি নেক আমলের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই আপনার ভালো কাজের স্বীকৃতি যদি কেউ না দেয়, তার জন্য দু:খ করবেন না। কেননা ভালো কাজের প্রতিদান তো আপনি আল্লাহর কাছেই চাইবেন, মানুষের কাছে নয়। আল্লাহর এই বাণীকে আপনি বাস্তবায়ন করবেন:

﴿إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورٗا﴾

"তারা বলে- 'আমরা তোমাদেরকে খাবার খাওয়াচ্ছি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না, চাই না কোন কৃতজ্ঞতা। (সূরা ইনসান: ৯)

অতএব আপনারা অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করতে আগ্রহী হোন। কেননা এতে আছে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও আত্মার পবিত্রতা। প্রত্যেক সম্মানিত চরিত্র ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিজেকে অলংকৃত করতে চেষ্টা করুন। কেননা এটাই হচ্ছে বিজয় ও সফলতার ঠিকানা।

অত:পর জেনে রাখুন.. নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

দয়া-করুণা[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

আল্লাহর বান্দারা! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা আল্লাহ তাক্বওয়া ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না এবং তাক্বওয়াবান ছাড়া কারো প্রতি করুণা করবেন না।

হে মুসলিমগণ!

দ্বীন ইসলাম আল্লাহর অধিকার এবং সৃষ্টির অধিকার আদায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর অধিকার হচ্ছে: তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। মাখলুকের অধিকার হচ্ছে: তাদের প্রতি ইহসান করা, তাদের সাথে সদাচরণ করা। একটি মহান বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রদান করেছেন। সেটা হচ্ছে রহমত বা দয়া। সে সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা একশ ভাগ রহমত সৃষ্টি করে একভাগ সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন এবং নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট গোপন রেখেছেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

এই বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ ইলমের নেয়ামতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

---

[1]. খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ২৯ শে জুমাদা উলা, ১৪৩৬ হিজরী, মসজিদে নববী।

﴿فَوَجَدَا عَبۡدٗا مِّنۡ عِبَادِنَآ ءَاتَيۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَعَلَّمۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلۡمٗا﴾

“তখন তারা আমার বান্দাদের এক বান্দাকে পেল, যার প্রতি আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম আর আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম”। (সূরা কাহাফ: ৬৫)

এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বান্দাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের প্রশংসা করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ﴾

“তদুপরি সে মু’মিনদের মধ্যে শামিল হয় আর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়”। (সূরা বালাদ: ১৭)

বান্দাদের অধিকার সমূহ এই দয়া বা করুণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। চাই তা ওয়াজিব অধিকার হোক যেমন: যাকাত। অথবা মুস্তাহাব অধিকার হোক যেমন সাদাকা, ক্ষমা। শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন, ‘সৃষ্টির উপকার এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এটাই হচ্ছে রহমত বা দয়া, যা দিয়ে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণ করা হয়েছে”।

এটা আল্লাহর একটি অনুগ্রহ। বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। জনৈক বেদুঈদ তার সন্তানদের প্রতি দয়া না করে রূঢ়তা করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তোমার অন্তর থেকে আল্লাহ যদি করুণা ছিনিয়ে নেন, তাতে আমি কি করতে পারি”। (বুখারী ও মুসলিম) আল্লাহ যখন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার অন্তরে করুণা নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡ﴾

“তিনিই প্রশান্তি নাযিল করেন”। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

অর্থাৎ করুণা নাযিল করেন। "মু'মিনদের অন্তরে যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়িয়ে নেয়"। (সূরা ফাতাহ: ৪)

প্রত্যেক ব্যক্তি হেদায়াত অনুপাতে দয়ার অংশ লাভ করে থাকে। পূর্ণ ঈমানের অধিকারী মুমিনগণ সবচেয়ে বেশী দয়ার অধিকারী হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল। আর যে সব লোক তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াশীল"। (ফাতাহ: ২৯) আর আল্লাহ মুমিনদের বিবরণ দিয়ে বলেছেন,

﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

"তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল"। (মায়েদা: ৫৪) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অর্থাৎ "তারা দয়াবান"। অন্তরে দয়ার পূর্ণতা সুখী মানুষের পরিচয়। এটা আল্লাহর দয়া লাভের অন্যতম কারণ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দয়াশীলদের প্রতি রহমানও দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে যিনি আকাশে আছেন তোমাদের উপর দয়া করবেন"। (আবু দাউদ)

যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে: তাদের মধ্যে একদল মানুষ এমন হবে, যাদের অন্তর ঈমানের সাথে দয়া ও নম্রতায় পরিপূর্ণ ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তিন প্রকার মানুষ জান্নাতী হবে। (এক প্রকার মানুষ) তারা, যারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং নেক কাজের তাওফীক লাভে ধন্য। (দ্বিতীয়) তারা ঐ সমস্ত মানুষ, যারা দয়ালু এবং আত্নীয়-স্বজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি কোমলচিত্ত। (তৃতীয়) ঐ সমস্ত মানুষ, যারা পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাঞ্চাকারী নয় এবং সন্তানাদি সম্পন্ন লোক"। (মুসলিম)

অন্তরে দয়া না থাকলে তা কঠোর হয়ে যায়। এ জন্য আল্লাহ একদল মানুষকে তিরস্কার করে বলেছেন,

﴿ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ﴾

"এরপরও তোমাদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে গেল"। (বাকারা: ৭৪) বাগাভী (রহ.) বলেন, 'অর্থাৎ শুষ্ক ও রূঢ় হয়েছে। অন্তরের শুষ্কতা হচ্ছে: সেখান থেকে দয়া ও নম্রতা বের হয়ে যাওয়া। এটাই হচ্ছে: দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দুর্ভাগা মানুষ ছাড়া কারো অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয় না"। (আবু দাউদ)

যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না"। (বুখারী ও মুসলিম) দয়ার সামান্যতম আচরণ থেকে যে দূরে থাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতিবাদ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হাসান ইবনু আলীকে চুম্বন করেন। ঐ সময় তার নিকট আকরা ইবনু হাবিস তামীমী (রাঃ) বসা ছিলেন। আকরা বললেনঃ আমার দশটি পুত্র সন্তান আছে আমি তাদের কাউকে কোন দিনই চুম্বন করিনি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "যে দয়া করে না তাকে দয়া করা হয় না"। (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে বাত্ত্বাল (রহ.) বলেন, "শিশু বাচ্চাকে দয়া করা, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরা, তাকে চুম্বন করা এবং তার প্রতি নম্র আচরণ করা এমন আমল যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন। ছোট বাচ্চাকে চুম্বন করা, তাকে কোলে নেয়া এবং তাকে জড়িয়ে ধরা এমন আচরণ যার কারণে আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত হয়।"

দয়া পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ হচ্ছে: পিতা-মাতা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ﴾

"তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৪) যে সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দয়ার অধিক নিকটবর্তী সেই উত্তম সন্তান। আল্লাহ বলেন,

﴿فَأَرَدۡنَآ أَن يُبۡدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيۡرٗا مِّنۡهُ زَكَوٰةٗ وَأَقۡرَبَ رُحۡمٗا﴾

"এ কারণে আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তার পরিবর্তে অধিক পবিত্র ও দয়া-মায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ (সন্তান) দান করবেন"। (সূরা কাহাফ: ৮১) মুমিনদের পারস্পারিক দয়া ও করুণা তাদেরকে একটি দেহের ন্যায় করে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদেরকে একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়"। (বুখারী ও মুসলিম)

চতুস্পদ জন্তুর উপরও দয়া করতে ইসলামী শরীয়ত উদ্বুদ্ধ করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়াপরবশ হও, তবে আল্লাহও তোমার প্রতি দয়াপরবশ হবেন"। (আহমাদ)

একজন মুমিন কাফেরকেও দয়া করে থাকে, কেননা সে হেদায়াত বঞ্চিত। তাকে সে ঘৃণা করে থাকে, কেননা তার ঈমান নাই। যে ব্যক্তি পাপাচারের মধ্যে পা পিছলে পড়ে গেছে, সে নসীহতের দয়া ও হেদায়াতের জন্য দুয়ার উপযুক্ত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক লোককে আনা হল, সে মদ পান করেছিল। তিনি বললেনঃ তোমরা একে প্রহার কর। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, তখন আমাদের মাঝে কেউ হাত দিয়ে প্রহার করল, কেউ জুতা দিয়ে

মারল, আর কেউ কাপড় দিয়ে মারল। মারধর যখন থামল তখন একজন বলে উঠল, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "এমন বলো না, শয়তানকে এর বিরুদ্ধে সাহায্য করো না। কিন্তু বলো, আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন"। (আহমাদ)

সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দয়াবান হচ্ছেন: আল্লাহর রাসূলগণ। তারা জাতির হেদায়াতের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সবধরণের পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। তারা কষ্টে ধৈর্যাবলম্বন করেছেন। তাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেয়ার বদদুয়া থেকে বিরত থেকেছেন। আদম (আ.) তার সন্তানদের মধ্যে যারা জাহান্নামের অধিবাসী তাদেরকে দেখে কেঁদেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজের ঘটনায় বলেন, "আমি জিবরীলকে বললাম কে এই ব্যক্তি? তিনি জবাব দিলেন । ইনি হচ্ছেন আদম (আঃ)। আর তার ডানে বামে রয়েছে তার সন্তানদের রূহ। তাদের মধ্যে ডান দিকের লোকরা জান্নাতী আর বাম দিকের লোকরা জাহান্নামী। ফলে তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবরাহীম (আ.) নিজ জাতির প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি তার রবকে বলেছেন,

﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّيۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"কাজেই যারা আমাকে অনুসরণ করবে তারা আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে সেক্ষেত্রে তুমি তো বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু"। (সূরা ইবরাহীম: ৩৬) তার অন্তরের নম্রতার কারণে তিনি ফেরেশতাদের সাথে বিতর্ক করে আবেদন করেছেন যাতে তারা লূত (আ.)এর জাতিকে ধ্বংস না করেন, যেন তারা ঈমান আনয়ন করে।

মুসা (আ.) দুজন নারীর প্রতি দয়া করে তাদের জন্য পানি উঠিয়ে দিয়েছেন। অথচ তিনি ছিলেন দৃঢ়তা সম্পন্ন নবীদের মধ্যে অন্যতম একজন। এমনকি তার দয়া এই উম্মত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। মেরাজের রাতে তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যেন তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন করেন, যাতে তিনি তার উম্মতের জন্য সালাতের সংখ্যাকে হ্রাস করে দেন। ফলে আল্লাহ তা পঞ্চাশ থেকে হ্রাস করে পাঁচ-এ নামিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা ইয়াহইয়া (আ.)কে দয়াময় ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا﴾

"আর (দিয়েছিলাম) আমার পক্ষ থেকে দয়া-মায়া ও পবিত্রতা। সে ছিল আল্লাহভীরু"। (সূরা মারইয়াম: ১৩) ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে: আমার পক্ষ থেকে তাকে দয়া প্রদান করেছি, যাতে তিনি বান্দাদের প্রতি সদয় হন এবং তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহবান করেন আর ইখলাসের সাথে সৎ আমল করেন।

ঈসা (আ.)কে আল্লাহ মায়ের সাথে সদাচরণশীল বানিয়েছেন। দয়াহীন দাম্ভিক বানাননি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾

"আর (তিনি আমাকে করেছেন) আমার মাতার প্রতি সদয়, তিনি আমাকে দাম্ভিক হতভাগ্য করেননি"। (সূরা মারইয়াম: ৩২) পূর্ব যামানার একজন নবীকে জাতির লোকেরা প্রহার করে তার শরীর রক্তাক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু নিজের মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন, "হে রব তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা জানে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দয়াবান ছিলেন। তার একটি নাম হচ্ছে: "নাবিউর রাহমাহ" (দয়ার নবী)। (নাসাঈ) যখন তাকে বলা হলো: মুশরিকদের উপর বদদুয়া করুন। তিনি বললেন, "আমি অভিশাপকারী হিসেবে প্রেরিত হইনি। আমি তো দয়াবান হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"। (মুসলিম) জাতির লোকেরা তাকে কষ্ট দিলে পাহাড়ের ফেরেশতা তাকে ডাক দিয়ে সালাম দেন এবং বলেন, "হে মুহাম্মদ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছেধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন (দু'টি কঠিন শিলার পাহাড়) কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾

"আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য পাঠিয়েছি কেবল রহমত হিসেবে"। (আম্বিয়া: ১০৭) যে ব্যক্তি এই রহমতকে গ্রহণ করবে, এই নেয়ামতের শুকরিয়া করবে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। যে এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে ও অস্বীকার করবে, সে দুনিয়া-আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَرَحۡمَةٞ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡۚ﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ”। (তাওবা: ৬১)

তিনি উম্মতের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীম (আঃ) এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন,

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু”। (সূরা ইব্রাহীম ৩৬) এবং ঈসা (আঃ) এর উক্তি (এ আয়াতটি পাঠ করলেন),

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

“যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত) অতঃপর তিনি তার হাত দু’খানি উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও—আর তোমার রব বেশী জানেন—তারপর তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর। সুতরাং জিবরীল তার নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সে কথা জানালেন, যা তিনি (তার উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন—আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বললেন, হে জিবরীল! তুমি (পুনরায়) মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট করে

দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না। (মুসলিম) নববী (রহ.) বলেন, ‘এই হাদীছটি এই উম্মতের জন্য সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক হাদীছ’।

তিনি তার সাহাবীদের প্রতি করুণাশীল ছিলেন। সা’দ ইবনু উবাদা (রাঃ) পীড়িত হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবী (রা.)এর সাথে তার শুশ্রূষার জন্য গেলেন। যখন তার কাছে গেলেন তখন তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি ওফাত হয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তার মৃত্যু হয়নি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁদতে দেখে সাহাবাগণও কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম) একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একটি শিশুকে তুলে ধরা হল, তখন তার রুহ বের হওয়াকালীন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে তার চোখ- থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন সা’দ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ কি? তিনি বলেন, এ হল রহমত যা আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। মালেক বিন হুওয়াইরেছ (রা.) বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হাযির হলাম। আমরা বিশ রাত তার নিকট অবস্থান করলাম। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাকে জানালাম। তিনি দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে

যাও। আর তাদের (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও। তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি বয়সে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি নারীদের প্রতি ছিলেন দয়াবান। তিনি সালাতকে সংক্ষেপ করতেন, যাতে মা ও শিশুদের জন্য কষ্ট না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছে নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি"। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি শিশুদের প্রতিও ছিলেন দয়াশীল। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাইতে শিশুদের প্রতি বেশী দয়াশীল আর কাউকে আমি দেখিনি। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ হাসান ও হুসাইন (রাঃ) লাল বর্ণের জামা পরিহিত অবস্থায় (শিশু হওয়ার কারণে) আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হতে নেমে তাদের দু'জনকে তুলে এনে নিজের সম্মুখে বসান, তারপর বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন,

﴿إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ﴾

"তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা

বিশেষ” (সূরা তাগাবুন: ১৫)। আমি তাকিয়ে দেখলাম এই শিশু দুটি আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, এমনকি আমার বক্তৃতা বন্ধ করে তাদেরকে তুলে নিতে বাধ্য হলাম। (আহমাদ) ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, ‘শিশুদের প্রতি এটা তার পূর্ণ দয়া, কমলতা ও স্নেহপরবশ হওয়ার প্রমাণ। এর মাধ্যমে তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন কিভাবে ছোটদের প্রতি করুণা করতে হয়, তাদের প্রতি কোমল ও স্নেহশীল হতে হয়’।

এই উম্মতের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে দয়াশীল ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ। আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾

“কাফেরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু তারা পরস্পরের প্রতি করুণাশীল”। (সূরা ফাতাহ: ২৯) এদের মধ্যে সবচেয়ে দয়াবান ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আল্লাহ তাকে প্রশস্ত ইলম ও দয়া দান করেছিলেন। ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, ‘এভাবেই মানুষের ইলম যত প্রশস্ত হয়, তার দয়া তত প্রসারিত হয়’। উলামা ও সৎ লোকেরাও দয়াবান হয়ে থাকেন। তারা মানুষের কল্যাণ ও হেদায়াতের জন্য প্রচেষ্টা করেন। তারা বিরোধীদের প্রতি জুলুম করেন না এবং তাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেন না।

অতঃপর হে মুসলিমগণ!

ইসলামী শরীয়ত তার দয়া ও ইনসাফ বন্ধু-শত্রু সকলের জন্য প্রশস্ত রেখেছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়ার প্রত্যাশী হবে, সে যেন তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাকেই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন যারা মানুষের প্রতি দয়ালু হয়"। (বুখারী ও মুসলিম) আল্লাহ যাকে দয়া করবেন, সে সৌভাগ্যের সাগরে ভাসবে। দুনিয়া ও আখেরাতের সুন্দর পরিণাম হাসিল করবে।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ﴾

"উত্তম কাজের প্রতিফল উত্তম পুরস্কার ছাড়া কী হতে পারে"? (সূরা রহমান: ৬০)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّهِ على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

হে মুসলিমগণ!

দয়া অর্জনের মাধ্যমে অহংকার ও মানুষকে অবজ্ঞা করা থেকে অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়। এটা কঠোরতা ও নির্দয়তা এবং দুর্বলতা ও অক্ষমতার মাঝামাঝি বিষয়। করুণা ও সহানুভূতি এমন দুটি গুণ যা আল্লাহ পছন্দ করেন, যদি তার জন্য আল্লাহর দ্বীন নষ্ট না হয়; যেমন মানুষের উপর দয়া দেখাতে গিয়ে দন্ড প্রয়োগ বাদ দিতে বলা। বান্দা যখন সংশয় ও প্রবৃত্তির ফেতনা থেকে মুক্ত হবে, তখন সে হেদায়াত ও রহমত লাভ করবে। আল্লাহ আসহাবে কাহাফের কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا﴾

“তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত দান কর আর আমাদের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে দাও।“ (সূরা কাহাফ: ১০)

রহমত প্রাপ্তির অন্যতম কারণ হলো পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, দান-খয়রাত করা, দুস্থ ও অসুস্থদের প্রতি ইহসান করা, পুরুষদের কবরস্থান যিয়ারত, অধিক হারে কুরআনুল আযীম তেলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকির করা।

অতঃপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

লজ্জাশীলতা কল্যাণকর[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করুন এবং সুদৃঢ় রজ্জুর মাধ্যমে ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহর ইবাদতের চাবি ও তার গোপন রহস্য হচ্ছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান। কেননা তাঁর নামগুলো অতিব সুন্দর এবং গুণগুলো সুউচ্চ। আল্লাহর প্রত্যেকটি নাম ও গুণের দ্বারা বিশেষ ইবাদত করা যায়। এই ইবাদত হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে ইলম অর্জনের আবশ্যকতা ও দাবী। আল্লাহ নিজের নাম ও গুণাবলী পছন্দ করেন। তিনি চান এগুলোর প্রভাব বান্দার মধ্যে প্রকাশিত হোক। এই জন্য এগুলো দ্বারা তাঁর কাছে দুয়া করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾

“আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। কাজেই তোমরা তাকে ডাক ঐ সব নামের মাধ্যমে”। (আ’রাফ: ১৮০) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যে তাঁর পছন্দনীয় গুণাবলী (যেগুলো তাঁর জন্য

[1]. খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ৭ ই জুমাদিউস সানী, ১৪৩৯ হিজরী, মসজিদে নববী।

খাস নয়) দ্বারা নিজেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করতে পারে। যে ব্যক্তি তাঁর গুণাবলী দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করবে সে তাঁর রহমতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নামগুলো আয়ত্ত্ব করবে (মুখস্ত করবে এবং অর্থ জেনে আমল করবে) তাকে তিনি জান্নাতের মেহমান বানাবেন। আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে: الحَيِيّ। বা অধিক লজ্জাশীল। তাঁর সিফাত বা গুণ হচ্ছে লজ্জা করা। মহান আল্লাহ এই গুণ দ্বারা নিজের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তো মশা অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না”। (বাকারা: ২৬) এই নামটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জন্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ তা’আলা লজ্জাশীল, দোষ আড়ালকারী। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন”। (আবু দাউদ) কেউ যদি আল্লাহর কাছে কিছু আবেদন করে, তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা’আলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোন ব্যক্তি তার দরবারে দুই হাত তুলে (প্রার্থনা করে) তখন তিনি তার হাত দু’খানা শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন”। (আবু দাউদ) ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন: ‘বান্দাকে আল্লাহর লজ্জাবোধ এমন একটি বিষয় যা বোধগম্য হয় না, সাধারণ বিবেক দিয়ে তার নিয়মও বুঝা যায় না। কেননা সেটা হচ্ছে উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা ও মহিমার লজ্জা’।

মানুষের সম্মানজনক স্বভাবের মূল ও সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সর্বাধিক উপকারী বিষয় হচ্ছে: লজ্জা। এটা হচ্ছে এমন একটি স্বভাব যা মানুষকে নিকৃষ্ট বিষয় বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং হকদারের হক আদায়ে অবহেলা করতে বাধা দেয়। জীবনের উৎস ও উপাদান এবং অন্তরের সজিবতা অনুযায়ী তাতে লজ্জা হয়ে থাকে। অন্তর যত বেশী জীবিত থাকবে, সেখানে লজ্জাশীলতা হবে কামেল ও শক্তিশালী। নবুওয়তের প্রথম যুগ থেকেই লজ্জাশীলতা মজবুত ও তার ব্যবহার আবশ্যক ছিল। প্রতেক নবী এ বিষয়ে তার জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এটা দিয়েই তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্বের নবীদের শরীয়তের অনেক রীতি-নীতি রহিত হয়ে গেলেও এ বিষয়টি রহিত হয়নি। যেগুলো পরিবর্তন করার তা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এটা আগের মতই রয়ে গেছে। কেননা এটা এমন একটি বিষয় যা সঠিক বলে জানা গেছে, এর ফযীলত সুস্পষ্ট এবং এর কল্যাণের বিষয়ে মানব বিবেক ঐক্যমত। এই যার বৈশিষ্ট্য তা রহিত করা বা পরিবর্তন করা জায়েজ নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "পূর্ববর্তী নবীদের নাসীহত থেকে মানুষ যা লাভ করেছে তার একটা হলো, যদি তুমি লজ্জাই না কর, তবে যা ইচ্ছে তাই কর"। (বুখারী)

লজ্জার মাধ্যমে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষগণ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছেন। আল্লাহ লজ্জাশীলদের প্রশংসা করেছেন। ফেরেশতাদের মধ্যেও এই গুণ ছিল। উসমান (রা.) সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি কি সে ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, ফেরেশতারা যাকে লজ্জা করে থাকেন"। (মুসলিম) নবীগণ তাদের স্বজাতির মধ্যে লাজুক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। "সৃষ্টিকুল কিয়ামত দিবসে সুপারিশ চাইবে আদম, নূহ, মুসা (আ.)এর কাছে। তখন প্রত্যেকেই নিজের ভুলের কথা স্মরণ করে

আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন”। (বুখারী ও মুসলিম) মুসা (আ.)ও লাজুক ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সম্পর্কে বলেন, “মূসা (আলাইহিস সালাম) অত্যন্ত লজ্জাশীল মানুষ ছিলেন, সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। লজ্জার কারণে তার দেহের কোন অংশ খোলা দেখা যেত না”। (বুখারী)

আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে বেশী লাজুক ছিলেন। এমনকি তার চেহারায় এর চিহ্ন ফুটে উঠতো। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দানশীল কুমারী মহিলার চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোন জিনিসকে অপছন্দ করতেন আমরা তার মুখায়ব হতে তা বুঝতে পারতাম। (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেরাজের রাতে মুসা (আ.)এর পরামর্শে আল্লাহর কাছে সালাতের সংখ্যা কমানোর আবেদনের প্রেক্ষীতে শেষে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, “আমার রবের কাছে বারবার যেতে আমার লজ্জা লাগছে”। (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়নাব বিনতে জাহাশের সাথে বাসর করার সময় লোকদেরকে অলীমা খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হলো। তারা এসে খাওয়া-দাওয়া করল, বেরিয়ে চলে গেল। কিন্তু তিনজন লোক বাড়ির মধ্যে থেকে গল্প করতে লাগলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কিছু বলতে লজ্জাবোধ করলেন। তিনি বাড়ির মধ্যে তাদেরকে রেখে বের হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ﴾

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! নবীগৃহে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় খাদ্য গ্রহণের জন্য, খাদ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করে যেন বসে থাকতে না হয়। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ কর। অতঃপর তোমাদের খাওয়া হলে তোমরা চলে যাও। কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। তোমাদের এ কাজ নবীকে কষ্ট দেয়। সে তোমাদেরকে লজ্জাবোধ করে, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না"। (সূরা আহযাব: ৫৩) (হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে)

উসমান (রা.) ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে লাজুকতার বিষয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। একদা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট প্রবেশ করতে চাইলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের কাপড় ঠিকঠাক করে বসলেন। তখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "নিশ্চয় উসমান (রাঃ) বড়ই লাজুক পুরুষ। তাই আমি ভাবলাম, এ অবস্থায় তাকে আসতে বললে হয়ত সে তার প্রয়োজন আমার কাছে পেশ করতে পারবে না"। (মুসলিম)

নারীকে সৃষ্টি করাই হয়েছে লাজুকতা দিয়ে। লজ্জা নারীর ভূষণ ও সৌন্দর্য। লজ্জা নারীর দূর্গ ও নিরাপত্তা। আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুমারী মেয়ে তো (বিবাহের অনুমতির বিষয়ে) লজ্জাবোধ করবে? তিনি বললেন, বিবাহে তার সম্মতির পরিচয় হচ্ছে: নিরব থাকা"। (বুখারী) মাদইয়ানের অধিবাসী শুওয়াইব এর কন্যা মূসা (আ.)এর কাছে এলেন লজ্জার চাদরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে। তখন মেয়েটি নিজের হাত ও কাপড় দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে রাখছিল। সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَا ﴾

তখন নারীদ্বয়ের একজন তার কাছে সলজ্জ পদে আসল। সে বলল- 'আমার পিতা তোমাকে ডাকছে তুমি আমাদের জন্য (জন্তুগুলোকে) পানি পান করিয়েছ তোমাকে তার প্রতিদান দেয়ার জন্য। (সূরা কাসাস: ২৫) উম্মুল মুমেনিন আয়েশা (রা.) এর লজ্জা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তিনি নিজ গৃহেও পর্দা করতেন। কেননা সেখানে ওমার (রা.)কে দাফন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি যখন সেই ঘরে প্রবেশ করতাম যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন তখন আমি আমার চাদর খুলে রাখতাম। আমি মনে মনে বলতাম, তিনি তো আমার স্বামী, আর অপরজনও আমার পিতা। কিন্তু যখন 'উমার (রাঃ) কে এখানে তাদের সাথে দাফন করা হলো, আল্লাহর কসম, তখন থেকে আমি যখনই ঐ ঘরে প্রবেশ করেছি, উমারের কারণে লজ্জায় শরীরে চাদর পেঁচিয়ে রেখেছি। (আহমাদ)

জনৈক মহিলা অসুস্থায় সবর করেছেন, তবু লজ্জার পর্দাকে খুলে ফেলেননি। তাই তাকে জান্নাত দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) আত্বা বিন আবু রাবাহ (রহ.)কে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলেছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এই অবস্থায় আমি বিবস্ত্র হয়ে পড়ি। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করুন। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও, ধৈর্য ধারণ কর। তাহলে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুয়া করি যেন তিনি তোমাকে নিরাময় করে দেন। তখন সে বলল, আমি ধৈর্য ধারণ করব। তবে আমি যে ঐ অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে পড়ি! কাজেই আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন যেন আমি বিবস্ত্র না হয়ে পড়ি। তখন তিনি তার জন্য দুয়া করলেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

এটা একটি সম্মানিত নৈতিকতা। জাহেলী যুগের লোকেরাও এটাকে আঁকড়ে রেখেছিল। আবূ সুফ্ইয়ান (রাঃ) বলেন, -যখন বাদশা হিরাক্লিয়াস তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি কাফের ছিলেন- "আল্লাহর কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাচারী বলে প্রচার করবে, তাহলে তার প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু (মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম"। (বুখারী ও মুসলিম)

লজ্জাশীলতার মাধ্যমেই সৌভাগ্য লাভ হয়, সৌভাগ্যের উপকরণসমূহ হাসিল হয়। এর সবটুকুই কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লজ্জার সবটাই মঙ্গলজনক। রাবী বলেন যে, কিংবা বলেছেনঃ লজ্জাশীলতা পুরাটাই কল্যাণকর। (মুসলিম)

লজ্জাশীল মানুষের পরিণাম কল্যাণজনক। সে কখনোই অনুতপ্ত হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "লজ্জাশীলতা কল্যাণ ব্যতীত কিছু আনয়ন করে না"। (মুসলিম) ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "লজ্জাশীলতা হচ্ছে অন্তরের জীবনের উপাদান। এটা প্রত্যেক কল্যাণের মূল। এটা না থাকলে সকল কল্যাণ চলে যাবে"।

এটার সবচেয়ে মহান কল্যাণ হচ্ছে: নিজের আত্মাকে প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যের অভ্যাসে গড়ে তোলা। খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে রাখা। মানুষের লজ্জা যত বেশী হবে, তার ইজ্জত তত সুরক্ষিত থাকবে, দোষ-ত্রুটি প্রতিহত হবে এবং সৌন্দর্যগুলো প্রচারিত হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হচ্ছে: ঈমান হচ্ছে, কথা, বিশ্বাস ও কর্মের নাম। লজ্জাশীলতা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঈমানের শাখা

সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা"। (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, "লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। মুমিন জান্নাতী মানুষ। কোন মানুষের লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হলে তার ঈমানও ছিনিয়ে নেয়া হবে"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিলঃ তুমি খুবই লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম) কারো অন্তর থেকে লজ্জাশীলতা ছিনিয়ে নেয়া হলে তার চেয়ে বড় কোন শাস্তি নেই তার জন্য। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, লজ্জাশীলতা ও ঈমান সম্পূর্ণ একই প্রকৃতির। এদের একটি তুলে নেয়া হলে অপরটি দূরীভূত হয়ে যায়। (হাকিম)

লজ্জাশীলতা একটি ইবাদত, এটা অন্যান্য ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, ধার্মিকতার শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়। এর মধ্যে যে ত্রুটি করবে, সে নির্লজ্জতায় লিপ্ত হবে। ধার্মিকতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মাঝে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে লজ্জাশীলতা। লাজুক মানুষ লজ্জার কারণে পাপচার থেকে বিরত থাকে। যেমন ঈমানের কারণে পাপাচার থেকে বিরত থাকে। বান্দার নিকট থেকে যখন লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হবে তখন জঘণ্য কাজ ও হীন চরিত্রে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়ার জন্য তার কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে"। (বুখারী) ইবনে আবদুল বার বলেন, 'যার লজ্জাশীলতা তাকে আল্লাহর হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দিবে না, তার জন্য সাগীরা-কাবীরা যে কোন অপরাধে লিপ্ত হওয়া বরাবর হয়ে যাবে। এই হাদীসটিতে লজ্জা না থাকার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং ধমক দেয়া হয়েছে'।

পাপাচার বান্দার লজ্জাকে দূর্বল করে দেয়, হতে পারে এর কারণে তা পুরাটাই ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন তার অবস্থা সম্পর্কে মানুষ জানলে বা তার গোপন কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়লেও তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। বরং হতে পারে সে নিজেই তার অবস্থা ও কুশ্রী কাজ সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দিবে।

লজ্জা হচ্ছে মানুষের ভূষণ ও সৌন্দর্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকবে, তা তাকে কুলষিত করে ফেলবে, আর যে জিনিসের মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তা তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলবে"। (তিরমিযী)

লজ্জাশীলতা মানুষের ইজ্জত-সম্ভ্রম ও তাকে সুরক্ষার দাবীদার। ফলে প্রয়োজন থাকলেও মানুষের কাছে হাত পাতে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সে ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয়, যাকে এক বা দু'লোকমা ফিরিয়ে দেয় (অর্থাৎ- এতটুকু পেয়েই যথেষ্ট মনে করে ফিরে যায়, আর চেয়ে বেড়ায় না) বরং সে-ই প্রকৃত মিসকীন যার কোন সম্পদ নেই, অথচ সে (চাইতে) লজ্জাবোধ করে অথবা মানুষের কাছে অনুনয় করে চায় না"। (বুখারী ও মুসলিম)

লজ্জাশীলতা উত্তম শিষ্টাচারকে শাণিত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জিজ্ঞেস করলেন সেই বৃক্ষ সম্পর্কে যার সাথে মুসলিমদেরকে তুলনা করা হয়েছে। তখন ইবনু উমর (রাযিঃ) বলেন, আমার মনে হতে লাগল, সেটা হলো খেজুর গাছ। কিন্তু তখন আমি দেখলাম যে, আবু বকর ও উমর (রাযিঃ) কিছুই বলছেন না। তাই কোন কথা বা কিছু বলা আমার ভালো লাগলো না। অন্য বর্ণনায় আছে: (তাদের উপস্থিতিতে) আমি বলতে লজ্জা করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

যেমন কর্ম তেমন ফল। লজ্জাশীলতার ফল ও তার উত্তম প্রতিদান হচ্ছে, আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জা করে থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আর দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জা করলো, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে (বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করলেন"। (বুখারী ও মুসিলম) লজ্জাশীলতার মূল হচ্ছে: আল্লাহকে লজ্জা করা। যাতে তিনি তোমাকে যা নিষেধ করেছেন, তাতে লিপ্ত হতে না দেখেন। যা করতে আদেশ করেছেন সেখানে অনুপস্থিত থাকতে না দেখেন। আল্লাহকে লজ্জা করা অধিক উপযুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা যাথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা কর"। (তিরমিযী) আল্লাহকে লজ্জা করলে: অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। সেই নূর তাকে দেখাবে সে যেন পালনকর্তা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাকে লজ্জা করবে। আল্লাহর সামনে লজ্জা বাস্তায়ন হবে তার অনুগ্রহগুলো দেখা, সেগুলোকে বিশাল মনে করা এবং নিজের মধ্যে ত্রুটি ও ঘাটতি অবলোকন করার মাধ্যমে। আর এটাও মনে করবে যে তিনি গোপন ও লুকায়িত সবকিছু অবলোকন করেন।

বান্দা যখন তার প্রতি আল্লাহর দৃষ্টি আছে এটা জানবে, বুঝবে যে সে আল্লাহর চোখের সামনে আছে, তাঁর শ্রবনের গণ্ডির মধ্যে আছে এবং তিনি অত্যন্ত লাজুক, তখন সে নাখোশকারী কাজে লিপ্ত হতে লজ্জাবোধ করবে। প্রত্যেক মানুষের সাথে রয়েছে ফেরেশতা যারা তার থেকে আলাদা হয় না। তাদের সম্মানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: তাদেরকে লজ্জা করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ ۞ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ۞ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ﴾

"অবশ্যই তোমাদের উপর নিযুক্ত আছে তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লেখকগণ (যারা লিপিবদ্ধ করছে তোমাদের কার্যকলাপ), তারা জানে তোমরা যা কর"। (সূরা ইনফিতার: ১০-১২) ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, অর্থাৎ- তোমরা এই সংরক্ষক ফেরেশতাদেরকে লজ্জা করো, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করো। তোমাদের কাজগুলো দেখলে মানুষকে যেমন তোমরা লজ্জা পাও, তাদের ব্যাপারেও তেমন লজ্জা করো'।

মানুষকে লজ্জা করলে ভালো কাজে উৎসাহ তৈরী হয়। একজন সৎসঙ্গীর কাছে থাকলে তার নিকট থেকে কোন কিছু লাভ না করলেও যদি তাকে লজ্জা করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, তবে এটাই যথেষ্ট। মানুষকে লজ্জা করলে আল্লাহকে লজ্জা করতে উত্তম সহায়তা পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মানুষকে লজ্জা করে না, সে আল্লাহকেও লজ্জা করে না। লাজুক লোকদের সহবত গ্রহণ করলে লজ্জাশীলতাকে নবায়ন করা যায়। মানুষ যাদেরকে সম্মান করবে, তার মধ্যে নিজেকে সম্মান করা অধিক হকদার। কেউ যদি প্রকাশ্যে কোন কাজ করতে লজ্জা পায়; অথচ সেটা গোপনে করে, তাহলে সে নিজেকে সম্মান করল না। যে ব্যক্তি মানুষকে লজ্জা করে অথচ নিজেকে লজ্জা করে না, তার অর্থ হচ্ছে মানুষের চেয়ে সে নিজের কাছেই তুচ্ছ। আর যে ব্যক্তি মানুষকে ও নিজেকে লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না, সে তার পালনকর্তাকেই চিনল না। যে লোক নিজেকে লজ্জার পোশাকে আচ্ছাদিত করতে পারবে, মানুষ তার দোষ-ত্রুটি দেখতে পাবে না।

পরিশেষে, হে মুসিলমগণ!

ইসলাম হচ্ছে সকল প্রশংসিত ও সম্মানিত বিষয়ের ধর্ম। যাবতীয় উত্তম আচরণ ও সুউচ্চ গুণাবলী এতে সন্নিবেশিত। এমন কোন কল্যাণকর বিষয় নেই, যার নির্দেশনা ইসলাম দেয়নি, এমন কোন অকল্যাণ নেই যে সম্পর্কে সতর্ক করেনি। এই ধর্মকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। এর কারণে গর্বিত হবে, মানুষকে এর প্রতি আহ্বান করবে। আমাদের উপর অপরিহার্য হচ্ছে আল্লাহর আদেশ মেনে ও তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকার দ্বারা আল্লাহকে অবিচ্ছিন্নভাবে লজ্জা করা।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজী

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا﴾

“সে ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বীনে কে বেশি উত্তম যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, অধিকন্তু সে সৎকর্মশীল এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করে। আল্লাহ ইবরাহীমকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন”। (সূরা নিসা: ১২৫)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّهِ على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

হে মুসলিমগণ!

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে লজ্জাশীলতার প্রশংসা করেছেন, তা হচ্ছে: এমন স্বভাব যা ভালো কাজ করতে ও মন্দ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু দুর্বলতা ও অপারগতার কারণে আল্লাহর হক বা বান্দার হক আদায়ে ত্রুটি হলে সেটা কোন লজ্জাশীলতা নয়। লাজুকতা যদি তাকে কল্যাণ থেকে বিরত রাখে তবে তা কখনোই প্রশংসিত নয়।

আয়িশা (রাঃ) বলেন, আনসারী মহিলারাই উত্তম। লজ্জা তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি"। (মুসলিম) দ্বীন শিখতে কোন লজ্জা নেই। লজ্জা করে যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন বর্জন করে, সে চিরকাল মূর্খ ও বঞ্চিত থেকে যাবে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, "লাজুক বা অহংকারী কেউই জ্ঞান শিখতে পারে না"।

অতঃপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

নিন্দনীয় আচরণসমূহ

অহংকার[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহভীতি হচ্ছে প্রবৃত্তির বিপরীত চলার নাম। আর দুর্ভাগ্য হচ্ছে হেদায়াতের বিপরীত চলার পরিণাম।

হে মুসলিমগণ!

আদম সন্তানের সফলতা রয়েছে ঈমান ও নেক আমলের মধ্যে। নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। অন্তরের আমলগুলো সোওয়াব ও শাস্তির ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মতই। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণে সোওয়াব দেয়া হবে। সোওয়াব দেয়া হবে আল্লাহর প্রতি ভরসা, সন্তুষ্ট এবং ইবাদতের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণের উপরেও। অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে অহংকার, হিংসা, আত্মগরিমা, রিয়া প্রভৃতির কারণে। বান্দা যত বেশী আল্লাহর সামনে বিনয়ী হবে ও তাঁর ইবাদত করবে, তত বেশী সে তাঁর নিকটবর্তী হবে এবং মর্যাদাবান হবে।

সকল প্রকার নিন্দনীয় আচরণের মূল হচ্ছে: অহংকার ও নিজের

[1] . খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, পহেলা রজব, ১৪২৪ হি:, মসজিদে নববী।

বড়ত্ব প্রকাশ করা। এর দ্বারাই ইবলীস বিশেষিত ছিল। ফলে সে আদমকে হিংসা করে এবং অহংকারবশত: পালনকর্তার আদেশের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর বলেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾

“যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল”। (বাকারা: ৩৪)

এই অহংকারের কারণেই ইহুদীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখেও তার প্রতি ঈমান আনা থেকে পিছিয়ে থেকেছে। অথচ তারা তার নবুওতের সত্যতা জেনেছে। এই অহংকারই ইবনে সুলূল (মুনাফেকদের নেতা)কে সত্যিকারের আত্মসমর্পণ থেকে দূরে রেখেছে। এ কারণেই আবু জাহেল ইসলাম গ্রহণ করেনি। আর কুরায়শরা হেদায়াতের উপর কুফরীর অন্ধকারকে প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾

তাদেরকে যখন ‘আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই’ বলা হত, তখন তারা অহংকার করত”। (সূরা সাফফাত: ৩৫) সুলায়মান (আ.) বিলকীস এবং তার জাতিকে আহবান করেছিলেন সে যেন গর্ব ও বড়াই বর্জন করে অনুগত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ﴾

“আমার প্রতি উদ্ধত হয়ো না, অনুগত হয়ে আমার কাছে হাজির হও”। (সূরা নমল: ৩১) এই অহংকারই হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতা, ঝগড়া, মতবিরোধ ও পরস্পরকে ঘৃণার মূল কারণ। আল্লাহ বানী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেন,

﴿فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ﴾

“কিন্তু তাদের কাছে (সত্য মিথ্যা সম্পর্কিত নির্ভুল) জ্ঞান আসার পরও শুধু নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়ির কারণে তারা মতভেদ করেছিল”। (সূরা জাসিয়া: ১৭) এই কারণেই বানী ইসরাঈল তাদের নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও হত্যার মত ভয়ানক বিভিন্ন অপরাধ করেছিল। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ﴾

“অতঃপর যখনই কোন রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ”। (বাকারা: ৮৭) অহংকার হচ্ছে মুনাফেকদের অন্যতম পরিচয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ﴾

“তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তুমি দেখতে পাও তারা সদম্ভে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়”। (মুনাফেকূন: ৫)

অহংকারের কারণেই পূর্ববর্তী জাতিকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.) জাতি সম্পর্কে বলেন,

﴿وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارٗا﴾

“তখনই তারা তাদের কানে আঙ্গল ডুকিয়ে দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, জিদ করেছে আর খুব বেশি অহঙ্কার করেছে”। (সূরা নূহ: ৭) ফেরাউন ও তার জাতি সম্পর্কে বলেন,

﴿وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ إِلَيۡنَا لَا يُرۡجَعُونَ﴾

"ফেরাউন ও তার বাহিনী বিনা অধিকারে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল আর তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।"। (সূরা কাসাস: ৩৯) হূদ (আ.) এর জাতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿فَأَمَّا عَادٞ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةًۖ أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجۡحَدُونَ * فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا صَرۡصَرٗا فِيٓ أَيَّامٖ نَّحِسَاتٖ لِّنُذِيقَهُمۡ عَذَابَ ٱلۡخِزۡيِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَخۡزَىٰۖ وَهُمۡ لَا يُنصَرُونَ﴾

"আর 'আদ-এর অবস্থা ছিল এই যে, দুনিয়াতে তারা না-হক অহংকার করেছিল, আর বলেছিল- আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি চিন্তা করে দেখেনি যে, আল্লাহ- যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন- শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল? কিন্তু তারা আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করতেই থাকল। অতঃপর আমি অশুভ দিনগুলোতে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্ঝা বায়ু পাঠালাম, যাতে তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানজনক শাস্তি আস্বাদন করে। আখিরাতের শাস্তি অবশ্যই অধিক লাঞ্ছনাদায়ক আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না"। (সূরা ফুসসেলাত: ১৫-১৬)

অহংকারীরা মূলত: নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের শত্রু। আল্লাহ বলেন,

﴿قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ﴾

“তার জাতির উদ্ধত সর্দারগণ বলল, ‘ওহে শু‘আয়ব! আমরা তোমাকে আর তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবই, অথবা তুমি আমাদের ধর্মবিশ্বাসে অবশ্যই ফিরে আসবে”। (সূরা আ’রাফ: ৮৮) এই জন্য মূসা (আ.) অহংকারীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذۡتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٖ لَّا يُؤۡمِنُ بِيَوۡمِ ٱلۡحِسَابِ﴾

“মূসা বলল- আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল দাম্ভিক অহংকারীদের হতে, যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না”। (সূরা গাফের: ২৭)

অহংকারী মানুষ প্রবৃত্তির পুজারী হয়। নিজেকে দেখে পূর্ণতার চোখে আর অন্যরা সবাই তার দৃষ্টিতে অপূর্ণ। তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। ফলে সে নিজের প্রবৃত্তি যা চায় তা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে না। আল্লাহ বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلۡبِ مُتَكَبِّرٖ جَبَّارٖ﴾

“আল্লাহ এভাবেই প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন”। (সূরা গাফের: ৩৫) এরকম মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না”। (সূরা লোকমান: ১৮)

অহংকারী মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষণীয় বস্তু ও নিদর্শনাবলী থেকে উপদেশ গ্রহণ থেকে সরিয়ে রাখা হয়।

﴿سَأَصۡرِفُ عَنۡ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ﴾

"যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বেড়ায় আমি শীঘ্রই তাদের দৃষ্টিকে আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেব"। (সূরা আ'রাফ: ১৪৬) সত্য গ্রহণে অহংকারী মানুষ মিথ্যার কাছে মাথা নত করার রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণে কখনো তাকে দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করতে হয়। অহংকারের কারণেই নবুওতের যুগে জনৈক ব্যক্তির হাত অবশ হয়ে যায়। সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে একজন লোক তার বাম হাত দ্বারা আহার করল। (এ দেখে) তিনি বললেন, "তুমি ডান হাত দ্বারা খাও।" সে বলল, 'আমি পারবো না!' তিনি বদদুয়া দিয়ে বললেন, "তুমি যেন না পারো।" ওর অহংকারই ওকে (কথা মানতে) বাধা দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং তারপর থেকে সে আর তার হাতকে মুখে উঠাতে পারেনি"। (মুসলিম) একজন অহংকারীকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলাফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধ্বসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

পরকালে অহংকারী মানুষের সাথে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত ব্যবহার করা হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষের উপর নিজেকে বড় মনে করে, আখেরাতে মানুষ তাকে পদদলিত করবে। মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিচার দিবসে অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার আকারে জমায়েত করা হবে। মানুষেরা তাদেরকে পদদলিত করবে। বলা হবে পিঁপড়ার আকারে এগুলো কারা? বলা হবে, এরা হচ্ছে দুনিয়াতে অহংকারী মানুষ"। (বাযযার) নাওয়াদের উসূল গ্রন্থের লেখক বলেছেন, 'যে যত বেশী অহংকারী হবে, কিয়ামত দিবসে সে তত ক্ষুদ্র হবে। এভাবেই যে যত বেশী আল্লাহর জন্য বিনয়ী হবে, সে সৃষ্টিকুলের উপর

তত বেশী উচ্চ সম্মানী হবে।' যে ব্যক্তি অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার বহন করবে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। (মুসলিম) জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾

"অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়"? (সূরা যুমার: ৬০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয়, দাম্ভিক ব্যক্তি"। (বুখারী ও মুসলিম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর ঝগড়া করল। অতঃপর জাহান্নাম বলল, ক্ষমতাবান অহংকারী লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও নিঃস্ব লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম)

হে মুসলিমগণ!

অহংকার আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য। এটা নিয়ে কোন বিতর্ক চলবে না। মাখলুকের কেউ যদি এই বৈশিষ্ট্য নিতে চায়, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, সম্মান আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি টেনে নিতে চাইবে, আমি তাকে শাস্তি দেব"। (মুসলিম) মহান আল্লাহই হচ্ছেন গর্বকারী। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ﴾

"তিনি মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী"। (সূরা হাশর: ২৩)

ইসলাম আল্লাহর মহত্ত্ব ও গর্বের দিককে সংরক্ষণ করেছে এবং পালনকর্তার গর্বের মধ্যে কেউ যদি ভাগ বসাতে আসে তার সকল পথকে নিষিদ্ধ করেছে। তাই পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমকে হারাম করেছে। কেননা এগুলো গর্ব ও অহংকার ডেকে আনে। টাখনুর নীচে পোষাক পরিধানকারীকে শাস্তির হুমকি দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাবী বলেন, তিনি এটা তিনবার পাঠ করলেন। আবূ যার (রাঃ) আরয করলেন, ওরা ধংস হোক ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক। ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা হচ্ছে- যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে, সে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে"। (মুসলিম) অনুরূপভাবে অন্যের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে মুখ বাঁকা করা ও তা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখা নিষেধ। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্য সময় গর্ব করে চলাফেরা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ﴾

"অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না, আর পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না"। (লোকমান: ১৮) নিষেধ করেছে অহংকারবশত: বাকপটু কথা বলতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আর আখেরাতে তোমাদের মধ্যে সেই লোক আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ও আমার থেকে দূরে থাকবে যারা দুশ্চরিত্রবান, অতিরিক্ত কথা বলে, অহংকারবশত মানুষকে ঠাট্টা করে মুখ ভর্তি করে কথা বলে এবং গর্ব প্রকাশ করার জন্য বাকপটুতা দেখায়।"

তাঁরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! الْمُتَفَيْهِقُوْنَ কারা? তিনি বললেন, "যারা অহংকারী।" (অহংকারীরাই মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে মুখ ভর্তি করে কথা বলে) (তিরমিযী)

সুতরাং আপনি নিজের মধ্যে থেকে বড়ত্ব ও অহংকারের চাদরকে খুলে ফেলুন। কেননা এগুলো আপনার জন্য নয়; বরং তা স্রষ্টা আল্লাহর জন্য। আপনি নম্রতা ও বিনয়ের চাদর পরিধান করুন। কোন ব্যক্তির অন্তরে যখনই অহংকারের সামান্যতম অংশ প্রবেশ করবে, সে অনুযায়ী বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ বোধশক্তি তার থেকে লোপ পাবে। অহংকারের উৎপত্তি হচ্ছে পালনকর্তা সম্পর্কে ও নিজের সম্পর্কে অজ্ঞতা। কেননা যে ব্যক্তি তার পালনকর্তাকে তাঁর পূর্ণ গুণাবলী ও মহিমার বৈশিষ্টে চিনতে পারবে এবং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝতে পারবে, সে নিজেকে বড় ভাববে না ও অহংকার করবে না। সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহ.) বলেন, "যে ব্যক্তি অহংকারবশত পাপাচার করে তার ব্যাপারে ধ্বংসের অশংকা করো, কেননা ইবলীস অহংকার করেই নাফরমানী করেছে, ফলে সে অভিশপ্ত হয়েছে"।

যার অন্তরে এটা প্রবেশ করেছে তার উপর আযাব পতিত হয়। হালকা বা কঠিন আযাব কম বা বেশী অহংকারের অনুপাতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এর দরজাকে খুলে দিবে, তার জন্য হরেক রকমের অকল্যাণের দরজা খুলে যাবে। যে এই দরজাকে বন্ধ করবে, তার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় যাবতীয় কল্যাণের প্রশস্ত দরজাগুলো খুলে যাবে। অহংকার ঈমানের বিপরীত। অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থ: "যারা অহংকারবশতঃ আমার 'ইবাদাত করে না, নিশ্চিতই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (সূরা গাফের: ৬০)

কিছু অহংকার এমন আছে যা আবশ্যিক ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং তার অহংকার তাকে সত্য প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে বাধ্য করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতাটা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা"। (মুসলিম) কারো উপর গর্ব প্রকাশ করবেন না, কেননা আপনার পৃথিবী এক সময় নি:শ্বেষ হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর অধিকার হল, দুনিয়ার কোনো জিনিস উদ্ধত হলে, তিনি তাকে অবনত করে দেন।" (বুখারী)

হে মুসলিমগণ!

বিনয়েই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নতী বা সম্মান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হবে, তিনি তার মর্যাদা সম্মুন্নত করবেন"। (মুসলিম) এটা নবীদের আচরণ, ভদ্র মানুষদের পরিচয়। মুসা (আ.) দুজন নারীর জন্য পানি উঠিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা তাদের পিতা বৃদ্ধ ছিলেন। দাউদ (আ.) নিজের হাতের উপার্জন থেকে পানাহার করতেন। যাকারিয়া (আ.) কাঠুরে ছিলেন। ঈসা (আ.) বলেন,

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾

"আর (আল্লাহ আমাকে করেছেন) আমার মাতার প্রতি সদয়, তিনি আমাকে দাম্ভিক হতভাগ্য করেননি"। (মারইয়াম: ৩২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এমন কোন নবীকে আল্লাহ প্রেরণ করেননি যিনি ছাগল চরানোর কাজ করেননি"। (বুখারী) আমাদের নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নরম হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। মুমিনদের জন্য করুণাশীল ও তাদের জন্য দয়ার হাত অবনমিত রাখতেন। তাদেরকে কোমলতা প্রদর্শন করতেন। মানুষের বোঝা বহন করে দিতেন। নি:স্ব লোকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা দিতেন। নিজে গাধার পিঠে বসেছেন, সাথে অন্যকেও বসিয়েছেন। শিশুদেরকে সালাম দিতেন। কারো সাথে দেখা হলে তিনিই প্রথমে সালাম দিতেন। কেউ খাবারের জন্য ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিতেন যদিও তা (ছাগলের) সামান্য হাতের গোস্ত বা খুরের পায়া হয়। আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি সাংসারিক কাজ করতেন। (অর্থাৎ পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন) অতঃপর নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন"। (বুখারী)

বিনয় হচ্ছে সমাজে ইনসাফ, ভলোবাসা ও সম্প্রীতির মাধ্যম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, কেউ কারো উপর কেউ যেন গর্ব না করে এবং কারো প্রতি যেন কেউ যুলম না করে"। (মুসলিম) বিনয়ী ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহর জন্য অবনমিত থাকে। তাঁর বান্দাদের জন্য দয়া ও নম্রতার বাহুকে নত করে রাখে। মনে করে না কারো উপর তার কোন অধিকার আছে। বরং সে মনে করে তার উপরেই মানুষের সব অধিকার রয়েছে। এরূপ আচরণের অধিকারী আল্লাহ তাকেই করে থাকেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন, নিকটবর্তী করেন এবং সম্মান করেন।

অত:পর হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর অধিকার আদায়ের পর সবচেয়ে সম্মানজনক বিনয় হচ্ছে, পিতা-মাতার সামনে বিনয়ী হওয়া। তাদের সাথে সদাচরণ করা,

তাদেরকে সম্মান করা ও মন্দ বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা, তাদের প্রতি মমতা প্রকাশ করা, হাসি মুখে থাকা। তাদের সাথে কথা বলার সময় নম্রতা অবলম্বন করা। তাদেরকে শ্রদ্ধা করা ও তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর অধিকহারে দুয়া করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا﴾

"তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন"। (বানী ইসরাঈল: ২৪) তাদের আদেশকে অবজ্ঞা করা ও তাদের সামনে অহংকার প্রদর্শন করা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে বিরক্ত হওয়া এক প্রকার অহংকার ও অবাধ্যতা, এ ধরণের মানুষ জাহান্নামে প্রবেশের হুমকি প্রাপ্ত।

আপনি দ্বীনের জন্য বিনয়ী হোন। নিজের মত ও প্রবৃত্তি দ্বারা দ্বীনের বিপরীত চলবেন না। ইলম অর্জন ও আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন না। কেউ আপনাকে নসীহত করলে তা গ্রহণ করুন এবং তার শুকরিয়া করুন। আপনাকে কেউ ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করলে, তার উত্তমটা অনুসরণ করুন। অনুগত্যের কাজে নম্রতায় আছে সৌভাগ্য। ফুযায়ল (রহ.) বলেন, "হক বা সত্যের কাছে নত হওয়া ও তার অনুগত হওয়াই হচ্ছে বিনয়"। জনৈক ব্যক্তি মালেক বিন মেগওয়ালকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহকে ভয় করুন, তখন সাথে সাথে তিনি তার গাল মাটিতে রেখে দিলেন।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে পরস্পররের প্রতি বিনয়ী হবে, সাথে থাকবে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা। মুহাদ্দেসদের উস্তাদ আবু মুসা মাদীনী (রহ.) অনেক সময় শিশুদেরকে ফলক থেকে কুরআন পড়াতেন। অথচ তিনি ছিলেন অতি সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বক্তি। অসুস্থ লোকদের

প্রতি বিনয়ী হয়ে তাদেরকে সুশ্রূষা করবে, তাদের পাশে দাঁড়াবে, তাদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করবে। তাদেরকে আল্লাহর ফায়সালায় প্রতিদানের আশা দিবে, সন্তুষ্ট থাকতে ও সবর করতে পরামর্শ দিবে। অভাবী ও মিসকীনদের প্রতি নম্র আচরণ করবে। দরীদ্র ও অভাবী মানুষের সমস্যা বুঝার চেষ্টা করবে এবং লজ্জার কারণে মানুষের কাছে যারা হাতে পাতে না তাদের খোঁজ-খবর নিবে। নিজের সম্পদ দিয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবে। আপনার বংশ উঁচু হলেও তাদের জন্য বিনয় প্রকাশ করবেন। বিশর বিন হারেস (রহ.) বলেন, 'সেই ধনীর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি, যে গরীবের পাশেও বসে'।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ﴾

সেই আখিরাতের ঘর (জান্নাত) আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি, যারা পৃথিবীর বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য"। (সূরা কাসাস: ৮৩)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه.

অত:পর, হে মুসলিমগণ!

আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে দূরে থাকার সময় বান্দার বিনয়কে আল্লাহ পছন্দ করেন। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর জন্য নত হওয়া, মুসলমানদের প্রতি নম্রতা ও কোমলতা, তাদের দুর্ব্যবহার সহ্য করা এবং তাদের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে সম্মান অর্জিত হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

“আর মু’মিনদের জন্য তোমার (অনুকম্পার) ডানা মেলে দাও”। (সূরা হিজর: ৮৮) সেই সাথে আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতে হবে, হাদীস পড়তে হবে, মানুষের সামনে উত্তম আচরণ প্রদর্শন ও ভালো কাজ করতে হবে। কাউকে কষ্ট দেয়া ও গীবত-চুগোলখোরী থেকে বিরত থাকতে হবে। নিজেকে নয় বরং মানুষকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে তাদের উপকার করা।

বিনয়ী মানুষ অন্যকে দেখলে বলে, ইনি আমার চেয়ে উত্তম। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, “মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে উঁচু মানুষ যে নিজের মর্যাদার দিতে তাকায় না। শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে সবচেয়ে বড় মানুষ যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে দৃষ্টি দেয় না”। আল্লাহ আপনাকে কোন নেয়ামত দান করলে সেটা শুকরিয়া ও বশ্যতার সাথে গ্রহণ করুন।

আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রহ.) বলেন, 'বিনয়ের মূল কথা হচ্ছে: জাগতিক নেয়ামতের দিক দিয়ে যে তোমার চেয়ে নীচু পর্যায়ের তুমি নিজেকে তার স্থান রাখবে। যাতে তাকে বুঝাতে পারো যে তোমার এই জগতে তার উপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই'।

অতঃপর জেনে রাখুন.. নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

হিংসা[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলিমগণ!

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে অন্তরের বিশুদ্ধতার উপর। সোওয়াব ও শাস্তির ক্ষেত্রে অন্তরের আমলগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মতই। তাই আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতায় সোওয়াব দেয়া হয়। আবার হিংসা, অহংকার ও রিয়ার কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

নফল ইবাদতের চেয়ে অন্তরের বিশুদ্ধতা অধিক উত্তম। একজন মুসলিম তার অন্তর থেকে হিংসা ও বিদ্বেষকে দূর করতে না পারলে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। অন্তরকে বিশুদ্ধ রাখা নবীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাঁর খলীলের প্রশংসা করে বলেছেন:

﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

"সে যখন তার প্রতিপালকের কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাজির হল"। (সূরা সাফফাত: ৮৪)

---

[1] . খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ২৫ শে সফর, ১৪৩০ হি:, মসজিদে নববী।

দুবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়। একবার শিশুকালে, তখন তার ভিতর থেকে একটি রক্তপিন্ড বের করা হয়। দ্বিতীয় বার মেরাজের পূর্বে বক্ষ বিদীর্ণ করে স্বর্ণের পাত্রে রাখা যমযম পানি দিয়ে তার অন্তরকে ধৌত করা হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উম্মতকে শিক্ষা দিতে গিয়ে এই দুয়াটি পাঠ করতেন: وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي আমার অন্তরকে সরল পথের অনুসারী করুন, আমার জিহ্বাকে সদা সত্য বলার তাওফীক দিন এবং আমার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও যাবতীয় দোষ হতে মুক্ত রাখুন।" (আবু দাউদ)

আল্লাহর তায়ালা আনসারদের অন্তরের বিশুদ্ধতার প্রশংসা করে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ﴾

(আর এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা মুহাজিরদের আসার আগে থেকেই (মাদীনা) নগরীর বাসিন্দা ছিল আর ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যারা তাদের কাছে হিজরাত করে এসেছে। মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোন কামনা রাখে না"। (সূরা হাশর: ৯) অর্থাৎ- তাদের ভাই মুহাজিরদেরকে যে অনুগ্রহ দেয়া হয়েছে। আর তাদের পর সৎলোকদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾

(এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা অগ্রবর্তীদের পরে (ইসলামের ছায়াতলে) এসেছে। তারা বলে- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আর আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বড়ই করুণাময়, অতি দয়ালু।' (সূরা হাশর: ১০)

অন্তরের বিশুদ্ধতা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে উদ্দশ্য করে বলেন, "এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী মানুষ আবির্ভূত হবেন"। দেখা গেল একজন আনসারী ব্যক্তি হাযির হলেন। লোকেরা তাকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি কোন মুসলিমের ব্যাপারে আমার অন্তরে কোন প্রতারণা গোপন করে রাখি না। আল্লাহ কাউকে কোন কল্যাণ দান করলে আমি তাকে হিংসা করি না"। (আহমাদ)

সালাফগণ তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর (রহ.) তার সহপাঠী ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.)এর প্রশংসা করে বলেছেন, 'তিনি ছিলেন উত্তম পাঠক, ছিলেন উত্তম আচরণের অধিকারী। ছিলেন অনেক স্নেহপরায়ণ। কাউকে কখনো হিংসা করতেন না, কষ্ট দিতেন না, কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতেন না। কারো ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করতেন না'।

কিয়ামত দিবসে ঈমানের সাথে অন্তরের বিশুদ্ধতা ব্যতীত কোন ফায়দা নাই। আল্লাহর বলেন,

﴿يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ﴾

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না।

কেবল (সাফল্য লাভ করবে) সে ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে"। (সূরা শুআরা: ৮৮-৮৯) আল্লাহ তায়ালা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে দানের ক্ষেত্রে বান্দাদের একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ﴾

"রিযকের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন"। (সূরা নাহাল: ৭১)

হিংসা হচ্ছে নিন্দণীয় আচরণ ও ঘৃণ্য স্বভাব। হিংসুক এর দ্বারা অনুগৃহীত ও নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে টার্গেট করে। ইবলীস এই স্বভাবের ছিল। এই কারণে হিংসার বশবর্তী হয়ে আদমকে সিজদা করা থেকে বিরত থেকেছে।

﴿قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ﴾

"সে বলল- আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে"। (সূরা সোয়াদ: ৭৬) হিংসার মাধ্যমেই আকাশে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাফরমানী করা হয়েছে। ইহুদী-খৃষ্টানদের স্বভাব হচ্ছে হিংসা করা। আল্লাহ বলেন,

﴿أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ﴾

"কিংবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকেদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, সেজন্য কি এরা তাদের হিংসা করে"। (সূরা নিসা: ৫৪) হিংসা হচ্ছে রোগাক্রান্ত অন্তরের মানুষদের কথা। আল্লাহ বলেন,

﴿فَسَيَقُولُونَ بَلۡ تَحۡسُدُونَنَاۚ﴾

“তখন তারা বলবে- ‘তোমরা বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ”। (সূরা ফাতাহ: ১৫) হিংসা অনেক সময় মানুষকে কুফরীতে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ বলেন,

﴿إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

“তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল”। (সূরা বাকারা: ৩৪)

হিংসার কারণেই কাফেররা মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বের হওয়ার আশা করে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم﴾

“আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)”। (সূরা বাকারা: ১০৯) হিংসা অনেক সময় ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দেয়। মেসওয়ার বিন মাখরামা আবু জাহেলকে বললেন, “মুহাম্মাদ (সা.) এখন যা বলছেন তার পূর্বে কি তাকে কখনো মিথ্যার অভিযোগ দিয়েছো? সে বলল, আল্লাহর কসম তিনি আমাদের মাঝে এমন এক যুবক ছিলেন, যাকে বলা হতো ‘আল আমীন’ বা বিশ্বস্থ। আমরা কখনোই তার নিকট থেকে মিথ্যা কিছু পাইনি। সে বলল, তাহলে তোমরা তার অনুসরণ করছো না কেন? সে বলল, আমরা এবং বানু হাশেম নেতৃত্বের বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করেছি। তারা মানুষকে খাইয়েছে, আমরাও খাইয়েছি। তারা মানুষকে পান করিয়েছে, আমরাও করিয়েছি। তারা মানুষকে আশ্রয়

দিয়েছে আমরাও দিয়েছি। এমনকি দুটি সমান সমান ঘোড়ার ন্যায় আমরা যখন হাঁটুতে ভর দিয়ে প্রতিযোগিতায় নামবো, ঠিক সে সময় তারা বলল, আমাদের মধ্যে নবী আছে। তো আমরা এটা কোথায় পাবো? আল্লাহর কসম আমরা তার উপর ঈমান আনবো না এবং কখনো তাকে সত্য বিশ্বাস করবো না"।

হিংসার কারণে খুনের মত অপরাধেও জড়িত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِۚ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ﴾

"আদমের দু'পুত্রের খবর তাদেরকে সঠিকভাবে জানিয়ে দাও। উভয়ে যখন একটি করে কুরবানী হাজির করেছিল তখন তাদের একজনের নিকট হতে কবূল হল। অন্যজনের নিকট হতে কবূল হল না। সে বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব"। (মায়েদা: ২৭) হিংসা মানুষের অন্তরে বড় একটি ফেতনা বা পরীক্ষা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآۗ﴾

"আর এভাবেই আমি তাদের একদলকে অন্যদলের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি যাতে তারা বলে, এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন"। (সূরা আনআম: ৫৩) ইবনে রজব (রহ.) বলেন, 'হিংসা মানুষের স্বভাবে গেঁথে দেয়া আছে। যে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে সেই সফল হয়'।

হিংসা ঈমানের পূর্ণতার পরীপন্থী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "একজন বান্দার অন্তরে দু'টি জিনিস একত্রিত থাকতে

পারে না: ঈমান এবং হিংসা”। (নাসাঈ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উম্মতকে এই রোগ থেকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা পরস্পরকে হিংসা করো না, পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না”। (বুখারী ও মুসলিম)

হিংসা সকল অকল্যাণের উৎপত্তি স্থল। এর কারণে জুলুম হয়, সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ইবনে আকীল (রহ.) বলেন, “আচরণসমূহ নিয়ে আমি গবেষণা করলাম। দেখলাম সবচেয়ে বড় অনিষ্টকর হচ্ছে ‘হিংসা’।

হিংসুক ব্যক্তি দুর্বল আত্মার মানুষ। মানুষের প্রত্যেকটা নেয়ামত তার কাছে বিশাল মনে হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। ভালো কিছু প্রকাশ পেলে ব্যথিত হয়। অথবা কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে এমন সম্মান লাভ করলে সে দু:খিত হয়। সৃষ্টির উপর আল্লাহর অনুগ্রহ দেখলে তার চেহারা মলিন হয়ে যায়। কারো নেয়ামত দূর হয়ে গেছে দেখতে পেলে আনন্দিত হয়ে যায়। হিংসুক মানুষের আরাম নাই। সে মানুষের দু:খে খুশী হয়, তাদের খুশীতে দু:খিত হয়। আল্লাহর ফায়সালাকে সে অন্যায্য মনে করে। মানুষ কোন কল্যাণের উপযুক্ত হতে পারে এটা সে মানতেই পারে না। তার মুখের কথা অন্তরের কদর্যতাকেই প্রকাশ করে দেয়। আল্লাহর বলেন,

﴿أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخۡرِجَ ٱللَّهُ أَضۡغَٰنَهُمۡ﴾

যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ কখনো তাদের লুকানো বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না? (সূরা মুহাম্মাদ: ২৯) মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, “সাবধান হিংসা করবে না। কেননা হিংসার পরিণাম শত্রুর মাঝে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমার মধ্যে প্রকাশ পাবে”। হিংসা মানুষকে নিকৃষ্ট পথে নিয়ে যায় এবং তাকে লাঞ্ছনা ও

অবমাননার পথে পরিচালিত করে। যেমন ইউসুফ (আ.)এর ভাইদের বেলায় ঘটেছিল। যখন তারা তাদের সেই ভাইয়ের কাছেই অনুদান চেয়েছিল, যাকে তারাই এক সময় হিংসা করেছিল। তারা বলেছিল,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهۡلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئۡنَا بِبِضَٰعَةٖ مُّزۡجَىٰةٖ فَأَوۡفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقۡ عَلَيۡنَآۖ﴾

“যখন তারা ইউসুফের দরবারে উপস্থিত হল, তারা বলল, ‘হে আযীয! আমাদেরকে আর আমাদের পরিবারবর্গকে বিপদে ঘিরে ধরেছে, আর আমরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে এসেছি, আমাদেরকে পূর্ণ ওজনের শষ্য দিন আর আমাদেরকে দান খায়রাত করুন”। (ইউসুফ: ৮৮)

খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে হিংসার সমান কোন কিছু নেই। ব্যক্তির হিংসার প্রভাব হিংসাকৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনি যদি হিংসুকের দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও বিষন্নতা দেখেন তাহলে তার প্রতি দয়া করবেন। হিংসুক এমন বিষয়ে ব্যস্ত থাকে যা তার দরকার ছিল না। ফলে যা তার দরকার ছিল তা সে বিনষ্ট করে।

হিংসা হচ্ছে হিংসাকৃত ব্যক্তির উচ্চতার পরিচয়। কেননা মহান ছাড়া কারো প্রতি কেউ হিংসা করে না। কত গোপন নেয়ামতকে প্রকাশ করেছে হিংসুক। কত মানুষ হিংসার কোপে পড়ার পর প্রশংসিত হয়েছে। আদম (আ.)এর সন্তান হাবিলকে হিংসা করা হয়েছে। ফলে সে প্রশংসিত হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে তার আলোচনা স্থায়ী হয়েছে।

মানুষের মর্যাদা ও তার উপর আল্লাহর নেয়ামতের প্রকাশ অনুযায়ী তার প্রতি মানুষের হিংসা কম বা বেশী হয়। মানুষের সবচেয়ে বড় নেয়ামত যাতে তাকে হিংসার মোকাবেলা করতে হয়, তা হচ্ছে: ইসলামের নেয়ামত। আল্লাহর বলেন,

﴿وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٗ﴾

“তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, তারা নিজেরা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও”। (সূরা নিসা: ৮৯) কুরআনের নেয়ামতের কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হিংসা করা হয়েছে।

﴿وَقَالُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ عَلَىٰ رَجُلٖ مِّنَ ٱلۡقَرۡيَتَيۡنِ عَظِيمٖ﴾

“তারা বলল, এ কুরআন দু’জনপদের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ণ হল না”? (সূরা যুখরুফ: ৩১)

হিংসাকৃত ব্যক্তি মাজলুম। তার উচিত সবর করা, তাক্বওয়া অবলম্বন করা, ক্ষমা করা এবং মার্জনা করা। আল্লাহর বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۚ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ﴾

“কিতাবধারীদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে পোষিত হিংসার দাহনে ইচ্ছে পোষণ করে যে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে পারত; সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও মার্জনা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় হুকুম প্রকাশ করেন”। (সূরা বাকারা: ১০৯) ইউসুফ (আ.) তার ভাইদেরকে বলেছেন,

﴿لَا تَثۡرِيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَۖ﴾

“সে বলল, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই”। (সূরা ইউসুফ: ৯২)

হিংসুকের আগুন তার প্রতি ইহসানের মাধ্যমে নিভাতে হবে। তার হিংসার অনিষ্টতা যত বেশী হবে, তার প্রতি ইহসান, নসীহত ও দয়া তত বেশী প্রদর্শন করুন। হিংসা ঈমানের পূর্ণতার প্রতিবন্ধক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

হিংসা একটি গুনাহের কাজ। মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে তাওবা করা, আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা ও তাক্বদীরের কাছে আত্মসমর্পন করা। আল্লাহর ক্রিয়া-কর্মের বিরোধিতা করবে না। তার উচিত বান্দাদের উপর আল্লাহর দয়া ও বদান্যতায় খুশী প্রকাশ করা এবং নিজের অন্তর থেকে হিংসা নামক এই অপরাধকে প্রতিহত করা; আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য ও তাঁর আযাব থেকে বাঁচার আশায়। এই কারণে বান্দার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে অপছন্দ করা থেকে বিরত থাকবে। নিজের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের দিকে তাকাবে। নিজের উপর আল্লাহর নেয়ামতরাজীর কথা স্মরণ করবে। আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। প্রত্যেক হিংসাকারী ব্যক্তি অনেক সময় নিজেও অন্যের হিংসার মধ্যে পতিত হয়। হিংসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। যাকে হিংসা করেছে তার জন্য দ্রুত দুয়া করবে। মুসলিম ভাইয়ের জন্য অধিক কল্যাণ কামনা করবে। বিশ্বাস রাখবে যে, যিনি অন্যকে নেয়ামত দিয়েছেন তিনি তোমাকে তার চেয়ে বেশী নেয়ামত দিতে সক্ষম।

﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾

"এবং আল্লাহ মহা কল্যাণের অধিকারী"। (সূরা আল ইমরান: ৭৪)

হক পন্থায় দানের ক্ষেত্রে গীবতা (ঈর্ষা) করলে আখেরাতে মর্যাদার স্তর লাভ হবে।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ﴾

“তোমরা তা কামনা করো না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন”। (সূরা নিসা: ৩২)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় অন্তর হচ্ছে: যে অন্তর সবচেয়ে নরম ও পরিচ্ছন্ন। যে মুমিনের অন্তর বিশুদ্ধ তার চেয়ে শান্তিময় জীবন কারো নেই। যদি দেখতে পায় যে আল্লাহ তার ভাইকে কোন নেয়ামত দিয়েছেন তাতে সে খুশী প্রকাশ করে। সে মনে করে যে, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং এটার প্রতি বান্দা মুখাপেক্ষী। কোন মুসলিমের সাথে শত্রুতা পোষণ করে কেউ সফল হতে পারে না। আল্লাহ যা বন্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়াতে আছে অন্তরের শান্তি। বান্দা যত বেশী সন্তুষ্ট হবে, তার অন্তর তত বেশী নিরাপদ ও প্রশান্তিময় হবে।

মানুষের উপর আবশ্যক হচ্ছে নিন্দণীয় স্বভাব থেকে নিজের নফসকে পরাভূত করা। তাকে নিকৃষ্ট অভ্যাস থেকে বাধা দেয়া। যে সমস্ত বদভ্যাস থেকে অন্তরকে রক্ষা করতে হবে তার সমষ্টি হচ্ছে: লোভ-লালসা, প্রবৃত্তি, ক্রোধ ও হিংসা।

যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ তাকে নেয়ামত দান করুন, তাহলে সে যেন মানুষের অবস্থার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখে। যে নিজের গুনাহের দিকে তাকাবে, সে নিজের নেয়ামতগুলোকে অনেক বেশী মনে করবে। বান্দা আল্লাহর শুকরিয়ার চেয়ে অন্য কোন মাধ্যমে তার নেয়ামতকে সংরক্ষণ করতে পারে না।

আর আল্লাহর নাফরমানীর চেয়ে অন্য কোন মাধ্যমে তার নেয়ামত অপসারণের সম্মুখীন হয় না।

অতএব আপনারা তাঁর নেয়ামতরাজীর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন, তাহলে তিনি আরো বেশী করে তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন এবং এমন কল্যাণ দান করবেন যা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে আপনারা সৌভাগ্যবান হবেন।

অতঃপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

জুলুম[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে বেশ কিছু প্রশংসিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আর হুকুম দিয়েছেন সে যেন এগুলোর উপর চলে এবং অটল থাকে।

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ﴾

“এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন”। (সূরা রূম: ৩০) আবার তার মধ্যে রয়েছে কিছু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি আদেশ করেছেন, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এগুলোর মধ্যে একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য আছে, তাতে যদি নিজের লাগামকে ঢিল দেয়, তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

[1]. খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ১ লা সফর, ১৪২৯ হি:, মসজিদে নববী।

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ﴾

মানুষ অবশ্যই বড়ই যালিম, বড়ই অকৃতজ্ঞ।(সূরা ইবরাহীম: ৩৪)

উত্তম মানুষ জুলুম ও সীমালঙ্ঘণ থেকে সতর্ক থাকে এবং ইনসাফ ও তাক্বওয়া দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে। মহান আল্লাহ নিজেকে জুলুম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না”। (সূরা নিসা: ৪০)

আর এটাকে তিনি বান্দাদের পরস্পরের মাঝে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি হাদীসে কুদসীতে বলেন, “হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝেও তা হারাম ঘোষণা করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের উপর জুলুম করো না”। (মুসলিম)

জুলুম মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেয়, সমাজকে নষ্ট করে, দুর্বলকে পরাস্ত করে, দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে, জনপদ ধ্বংস করে এবং এ কারণে মানব জাতি ও শহর-বন্দর বিধ্বস্ত হয়। প্রথম রাসূল নূহ (আ.) জালেমদের বিরুদ্ধে বদদুয়া করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارٗا﴾

“আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না”। (সূরা নূহ: ২৮) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন গৃহ থেকে বের হতেন, তখন এটা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। তিনি বলতেন, আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। হে আমার রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলিত হওয়া থেকে, রাস্তা ভুলে যাওয়া থেকে, অত্যাচার করা হতে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, মূর্খতাসূলভ

আচরণ থেকে এবং কারও মূর্খতাসূলভ আচরণের শিকার হওয়া থেকে। (আহমাদ) এমনকি তিনি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই জুলুম থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (নাসাঈ) মুসলিমদেরকে নিষেধ করেছেন পরস্পরকে জুলুম করতে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না"। (বুখারী)

জুলুম হচ্ছে হচ্ছে: নিকৃষ্টতা। কেননা দুর্বল ছাড়া কেউ নির্যাতিত হয় না। ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, 'জুলুম ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে এত বেশী অপরাধ হয় না। কেননা সাধারণত দুর্বল ব্যতীত কাউকে জুলুম করা হয় না, যে নিজের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না'। এটা নিকৃষ্ট স্বভাব, বান্দাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে।

﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ﴾

"আমি ইয়াহূদীদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তা হারাম করে দিয়েছি তাদের জুলুমের কারণে"। (সূরা নিসা: ১৬০) সামান্য বস্তুতেও যদি জুলুম করা হয়, তবু তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে কেউ বিনা অধিকারে এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর দখল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ পরিমাণ সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে"। (বুখারী ও মুসলিম) একটি বিড়ালের প্রতি জুলুম যদি জাহান্নামে নিয়ে যায়, তাহলে মুসলিমের প্রতি জুলুমের পরিণাম তো আরো ভয়াবহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "জনৈক মহিলা একটা বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল,

খানাপানি কিছু দেয়নি। আর ছেড়েও দেয়নি যে তা জমিনের পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করত। (বুখারী ও মুসলিম)

জাতির লোকেরা যদি ঈমান আনে এবং করো প্রতি জুলুম না করে, তাহলে নিরাপদে থাকবে। আর জুলুম করলেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

﴿وَتِلۡكَ ٱلۡقُرَىٰٓ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ﴾

"ঐ সব জনদপকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম যখন তারা বাড়াবাড়ি করেছিল"। (ইউসুফ: ৫৯) আল্লাহ তায়ালা জালেমকে হুমকি দিয়েছেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন:

﴿فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمٍ أَلِيمٖ﴾

"কাজেই জালেমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের 'আযাবের দুর্ভোগ"। (সূরা যুখরুফ: ৬৫) আল্লাহ জালেমকে হেদায়াত করেন না, তাকে সাহায্য করেন না এবং তাকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

"আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না"। (সূরা আল ইমরান: ৫৭)

জালেম লেজকাটা হয়। তার মৃত্যুর পর কেউ ভালোভাবে তাকে স্মরণ করে না। আর আপনার পালনকর্তা তার জন্য ওঁত পেতে আছেন। তার পরিণাম ধ্বংস। তার শাস্তি কখনো দুনিয়াতেই হয়- যদিও মাজলুম তার উপর বদদুয়া না করে- তার শাস্তি বিরাট। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আখিরাতে শাস্তি সংরক্ষিত রাখার সাথে সাথে দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা যে অপরাধের কারণে শীঘ্র শাস্তি প্রদান করে থাকেন, তা হচ্ছে: জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। (তিরমিযী) আবার কখনো আল্লাহ তাকে ছাড় দিয়ে থাকেন, দুনিয়াতে কোন শাস্তি

দেন না; তাকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করার জন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। (বুখারী ও মুসলিম) কিয়ামত দিবসে তার জুলুমগুলোকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তার সামনে উপস্থিত করা হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে"। (বুখারী ও মুসলিম) সেদিন তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না, কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। তার কোন কৈফিয়ত গ্রহণ করা হবে না। পৃথিবীর সবকিছু মুক্তিপণ হিসেবে দেয়ার কামনা করবে; বরং তার সাথে আরেক পৃথিবীকে পেশ করতে চাইবে, যাতে তাকে নাজাত দেয়া হয় শাস্তি থেকে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦ﴾

"যারা অন্যায়কারী দুনিয়াতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু যদি তাদেরই হয়, আর তার সাথে আরো অত পরিমাণ হয়, তারা ক্বিয়ামতের কঠিন 'আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ স্বরূপ দিতে চাইবে"। (সূরা যুমার: ৪৭)

কোন জালিম যদি আরেক জালেমের সাথে বন্ধুত্ব করেও, তবু তাদের পরিণতি হয় বিচ্ছিন্নতা ও বিবাদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ﴾

"অন্যায়কারীরা চরম মতভেদে লিপ্ত আছে"। (সূরা হজ্জ: ৫৩) শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন, 'যখনই দুজন মানুষ কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে ঐক্যমত হয়, তারা অবশ্যই বিবাদে লিপ্ত হবে'। অত্যাচারী মানুষ অত্যাচার করে শান্তি পায় না; বরং তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী

অত্যাচারী দ্বারা পীড়িত হয়, ফলে সে তাকে পরাজিত করে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعۡضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾

“এভাবেই আমি জালেমদেরকে পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দেব সেই উপার্জনের বিনিময়ে যা তারা করেছিল”। (সূরা আনআম: ১২৯)

আল্লাহ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাবলে মাজলুমকে সাহায্য করেন এবং তার দুয়া কবুল করে থাকেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তিনটি দুয়া এমন যেগুলো অবশ্য কবুল করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই! মজলুমের দুয়া, মুসাফিরের দুয়া, পিতার দুয়া তার সন্তানের উপর”। (তিরমিযী)

যুবাইদী (রহ.) বলেন, ‘মাজলুম যখন আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে, তখন আল্লাহর ইনসাফ ফায়সালা করে ফেলে জালেমকে শাস্তি দেয়ার’। মাজলুমের দুয়া পৌঁছতে কোন পর্দা নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “মাযলুমের বদদুয়া থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন আড়াল নেই”। (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে আকীল (রহ.) বলেন, মাজলুম এবং নিরুপায় মানুষের দুয়া দ্রুত কবুল হয়’।

এক মহিলা সাঈদ বিন যায়দ (রা.)এর উপর অন্যায়বশত: অভিযোগ পেশ করে। অথচ তিনি ছিলেন, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন। তিনি নাকি ঐ মহিলার জমি জবরদখল করে নিয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আরওয়া যদি মিথ্যাবাদিনী হয় তবে তার দুই চক্ষু অন্ধ করে দিন এবং তার জমিতে তাকে মৃত্যু দান করুন। রাবী বলেন, এরপর সে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নাই। পরে

তার জমিতে চলার সময় আকস্মাৎ এক গর্তে পড়ে মারা যায়’। (মুসলিম)

সূরা কলমে আল্লাহ বাগানের মালিকদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তারা যখন ফকীরদেরকে তাদের অধিকার দিতে অস্বীকার করেছিল, তখন আল্লাহ তাদের ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,

﴿فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآئِفٞ مِّن رَّبِّكَ وَهُمۡ نَآئِمُونَ * فَأَصۡبَحَتۡ كَٱلصَّرِيمِ﴾

“অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পড়ল যখন তারা ছিল নিদ্রিত। যার ফলে তা হয়ে গেল বিবর্ণ কাটা ফসলের মত”। (সূরা কলম: ১৯-২০)

কোন মাজলুম যদি সবর করে, তাহলে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দিবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তিনটি বিষয়ের উপর আমি শপথ করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করছি, তোমরা তা মুখস্ত করে রাখ। তিনি বলেনঃ উক্ত তিনটি বিষয় হল (১) সাদকা করলে কোন বান্দার সম্পদ কমে না। (২) কোন বান্দার উপর জুলুম করা হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (৩) যখনই কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুলে দিবে তখনই আল্লাহ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবেন।” (তিরমিযী)

আল্লাহ কিয়ামত দিবসে মাজলুমের পক্ষে বিবাদ করবেন। আল্লাহ যার বিরোধী হবেন, সে পরাজিত হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ

মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে; অথচ তার পারিশ্রমিক দেয় না"। (বুখারী)

মাজলুম জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ তার পক্ষে প্রতিশোধ না নেয়া হবে এবং তাকে খুশী করে দেয়া হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মু'মিনগণ যখন জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার কিসাস নেয়া হবে।" (বুখারী)

অন্যতম জুলুম হচ্ছে: কর্মচারীকের তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অথবা তা থেকে কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া অথবা প্রদান করতে টালবাহানা করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে অধিকার আদায়ে দিব-দিচ্ছি বলে টালবাহানা করে দেরী করা অত্যাচারের শামিল"। (বুখারী ও মুসলিম)

আরেকটি জুলুম হচ্ছে: অপরের মালিকনাভুক্ত বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা বা তা ছিনিয়ে নেয়া বা তাতে তাদেরকে কষ্ট দেয়া। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিঘত ভূমিও আত্মসাৎ করে নিবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক ভূমির শৃঙ্খল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

জুলুম করে ইয়াতীমের সম্পদ কুক্ষিগত করা জাহান্নাম আবশ্যককারী অপরাধ। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ﴾

"যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো

নিজেদের পেটে কেবল অগ্নিই ভক্ষণ করে, তারা শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে"। (সূরা নিসা: ১০) স্বামীর হক আদায়ে স্ত্রীর গাফলতি, তার কল্যাণগুলোকে অস্বীকার এবং সে যা করেনি এমন বিষয়ে তার উপর অভিযোগ পেশ করা স্বামীর উপর স্ত্রীর জুলুম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে বলেন, "তোমরা তো উপকারকারীর উপকার অস্বীকার করে থাক"। (বুখারী ও মুসলিম) অনুরূপভাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর জুলুম অথবা যে সকল অধিকার স্ত্রীর জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আদায়ে গড়িমসি করা হচ্ছে তার উপর অন্যায়। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে ইনসাফ না করা এবং রাত যাপন ও খরচ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজনের দিকে অধিক ঝুঁকে যাওয়া এমন অন্যায় যার জন্য শাস্তির হুমকী দেয়া হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবস্থায় আসবে"। (আবু দাউদ)

এমনকি নিজের সন্তানদেরকে দান প্রভৃতির ক্ষেত্রে একজনের উপর আরেকজনকে প্রাধান্য দেয়া অথবা তাদেরকে লালন-পালন ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে গাফলতি করাও তাদের প্রতি পিতার জুলুম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো"। (বুখারী ও মুসলিম) আরেকটি জুলুম হচ্ছে: পিতার নিজ কন্যার বিবাহ না দেয়া অথবা অনুপযুক্ত পাত্রের সাথে সম্পদ বা অন্য কোন লোভে পড়ে বিবাহ দিয়ে দেয়া।

শিক্ষকের কোন ছাত্রের উপর অপর ছাত্রকে বিনা কারণে প্রাধান্য দেয়াও ইনসাফ থেকে বিচ্যুতি। শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন, "বিচারক তিন প্রকারের" এই হাদীছের মধ্যে শিশুদের শিক্ষকও শামিল হবে।

কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয়া বা তার ক্ষতি করা বড় ধরণের অত্যাচার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের মানসম্মানে হস্তক্ষেপ করা বড় ধরণের কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত"। (আবু দাউদ)

বিভিন্ন ধরণের ছবি-প্রতিকৃতি তৈরী করা বান্দার নিজের নফসের উপর জুলুম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেছেন: তাদের অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ (ছবি-প্রতিকৃতি) সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তাহলে তারা একটা অণুপরিমাণ বস্তু অথবা একটি শস্যদানা কিংবা একটি যব তৈরি করুক"। (বুখারী ও মুসলিম)

সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে: আল্লাহর সাথে শিরক করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾

"নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বিরাট জুলুম"। (সূরা লোকমান: ১৩) যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দুয়া করবে, বা মানত করবে বা তাওয়াফ করবে অথবা গাইরুল্লাহর জন্য পশু যবেহ করবে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করবে সে নিজের নফসের উপর জুলুমকারী। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে দ্রুত তাওবা করে আল্লাহ কাছে ফিরে আসা।

যে ব্যক্তি মানুষের উপর জুলুম করে, সে যেন তার উপর আল্লাহর ক্ষমতার কথা স্মরণ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا﴾

"এ জালেমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত

যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই জন্য”। (সূরা বাকারা: ১৬৫)

আল্লাহ তায়ালা জালেমের তাওবা কবুল করেন যদি সে তাওবা করে এবং জুলুমকৃত বস্তু তার মালিকের কাছে ফেরত দেয়। আল্লাহ বলেন

﴿فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ﴾

“কিন্তু অন্যায় করার পর কেউ তাওবা করলে এবং (নিজেকে) সংশোধন করলে, আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাদৃষ্টি করেন”। (সূরা মায়েদা” ৩৯) ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, ‘বান্দাদের পরস্পরের উপর জুলুমের কোন কিছুই আল্লাহ ছাড়বেন না, আল্লাহ তা পূর্ণরূপে আদায় করে দিবেন’।

আল্লাহর ইনসাফ হচ্ছে: সৃষ্টিকুলের প্রত্যেককে যে যার উপর জুলুম করেছে, তার থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমনকি চতুস্পদ জন্তুর পরস্পরের মাঝেও প্রতিশোধ নেয়া হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরী থেকে শিং বিহীন বকরীর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে”। (মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় থাকতেই জালেম যেন পরকালের হিসাবের দিন আসার পূর্বেই মাজলুমের নিকট থেকে সমাধান করে নেয়। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দ্বীনার বা দিরহাম থাকবে না। তার সৎকর্ম থাকলে তার জুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট হতে নেয়া হবে। আর তার কোন

সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে”। (বুখারী)

শিরকের জুলুম তাওহীদে ফিরে আসা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না। জালেম যাতে তার জুলুম থেকে বিরত হয় তার জন্য তাকে নসীহত করা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা মুসা ও হারূন (আ.)কে বলেন,

﴿ٱذۡهَبَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ﴾

“তোমরা দু’জন ফেরাউনের নিকট যাও, বস্তুতঃ সে সীমালঙ্ঘন করেছে। তার সঙ্গে তোমরা নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা (আল্লাহর) ভয় করবে”। (সূরা ত্বাহা: ৪৩-৪৪)

অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখার অর্থ হচ্ছে তাকে সাহায্য করা, যাতে শাস্তি তাকে ঘিরে না ধরে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালিম হোক অথবা মজলুম হোক। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুম হলে তাকে সাহায্য করব, তা তো বোধ্যগম্য ব্যাপার। কিন্তু জালিম হলে তাকে সাহায্য করব, তা কিভাবে? তিনি বললেনঃ তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হচ্ছে তার সাহায্য”। (বুখারী)

সুতরাং আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন, ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করুন। জুলুম থেকে সাবধান থাকুন। মুসলিমদের নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে সম্মান করুন। হিসাবের দিন আসার পূর্বে জুলুমকৃত বস্তুগুলো মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিন।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

﴿وَمَن يَظۡلِم مِّنكُمۡ نُذِقۡهُ عَذَابٗا كَبِيرٗا﴾

“তোমাদের মধ্যে যে অন্যায়কারী জালেম আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব”। (সূরা ফুরকান: ১৯)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

হে মুসিলমগণ!

সকল কল্যাণের মূল হচ্ছে: জ্ঞান ও ইনসাফ। আর সকল অকল্যাণের মূল হচ্ছে: মূর্খতা ও জুলুম। সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ যে তার প্রবৃত্তির চেয়ে বিবেককে ইনসাফের অনুকূল করে। জুলুম থেকে বাঁচার জন্য সহায়ক বিষয় হচ্ছে: আত্মতৃপ্তি, আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও অধিকহারে দুয়া। যে ব্যক্তি ইনসাফ করবে, পালনকর্তাকে ভয় করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে, সে নিরাপত্তা ও প্রশান্তির সাথে জীবন-যাপন করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾

“যারা ঈমান এনেছে আর যুলম (অর্থাৎ শিরক) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা লাভ তারাই করবে আর তারাই হল সঠিক পথপ্রাপ্ত”। (সূরা আনআম: ৮২)

বান্দারা যদি জুলুম থেকে দূরে থাকে এবং তাওবা ও দুয়ার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়, তাহলে তারা পুরস্কার ও কল্যাণ লাভ করবে।

অতঃপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

জালেমের পরিণাম[1]

إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

অতঃপর,

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহভীতি হচ্ছে হেদায়াতের পথ এবং এর বিপরীত হচ্ছে দুর্ভাগ্যের পথ।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তাকে সম্মানিত করেছেন। তার জন্য প্রশান্তির সকল উপকরণ প্রস্তুত করেছেন, যাতে তারা এক আল্লাহর ইবাদত তার নির্দেশিত পন্থায় করতে পারে। দ্বীনের উপর অটল থাকা ব্যতীত মানুষের জীবন সঠিকভাবে চলতে পারে না। এর উপরই নির্ভর করছে তাদের পরকালের সৌভাগ্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর একটি দুয়া ছিল: «**اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي**» হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীন ইসলাহ (পরিশুদ্ধ) করে দিন, যে দ্বীন আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করে দিন আমার দুনিয়াকে যেথায় আমার জীবিকা রয়েছে, আপনি ইসলাহ (কল্যাণকর) করে দিন আমার আখিরাতকে, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। (মুসলিম)

---

[1] . খুতবা প্রদানের তারিখ: শুক্রবার, ৩০ শে রবিউস সানী, ১৪৩৩ হি:, মসজিদে নববী।

দ্বীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে: বান্দার মাঝে এবং স্রষ্টার মাঝে এককভাবে তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, তাদের এবং মাখলুকের মাঝে পরস্পরের প্রতি জুলুম না করার মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কেননা জুলুম হচ্ছে সকল অকল্যাণের মূল এবং দ্বীন ও দুনিয়াকে বিনষ্টকারী। আল্লাহ নিজেকে জুলুম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন এবং বান্দাদের পরস্পরের মাঝে তা হারাম করেছেন। তিনি বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি আমার ওপর জুলুম হারাম করেছি, আমি তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি অতএব তোমরা পরস্পরকে জুলুম কর না"। (মুসলিম) আবু ইদরীস খাওলানী (রহ.) বলেন, এই হাদীছের বর্ণনাকারী যখন হাদীছটি বর্ণনা করতেন, তখন তার হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন।

আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তিনি জালেমকে পছন্দ করেন না। সে কখনো সফল হবে না। ওয়াদা করেছেন যে সে নির্বংশ হয়ে যাবে। সবসময় তাকে সাহায্য করবে এমন কাউকে পাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾

"আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই"। (আল ইমরান: ১৯২) বরং তার উপর তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী জালেমকে চাপিয়ে দিবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴾

"এমনিভাবেই আমি জালেমদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রভাবশালী বানিয়ে দিব।"। (সূরা আনআম: ১২৯) ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, 'অর্থাৎ- জুলুম ও সীমালঙ্ঘণের প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে পরস্পরের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করি এবং পরস্পরকে পরস্পরের মাধ্যমে ধ্বংস করি এবং একের দ্বারা অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি'।

আল্লাহ তাকে নিকৃষ্ট স্থানে প্রত্যাবর্তনের হুমকী দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ﴾

"জালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন্ (মহা সংকটময়) জায়গায় তারা ফিরে যাচ্ছে"। (সূরা শুআরা: ২২৭) শুরাইহ (রহ.) বলেন, 'নিশ্চয় জালেম শাস্তির অপেক্ষা করবে, আর মাজলুম সাহায্যের অপেক্ষা করবে'।

জালেমের দুনিয়ার দিনগুলো খুবই অল্প। আল্লাহ তাকে ছাড় দিয়ে রাখেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿فَلَا تَعۡجَلۡ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عَدّٗا﴾

"কাজেই তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না, আমি গুণে রাখছি তাদের জন্য নির্দিষ্ট (দিবসের) সংখ্যা"। (সূরা মারইয়াম: ৮৪) যার অত্যাচার দীর্ঘ হবে, তার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرۡيَةٖ كَانَتۡ ظَالِمَةٗ وَأَنشَأۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ﴾

"কত জনপদ ছিল যেগুলোকে আমি পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছি, যার অধিবাসীরা ছিল যালিম। তাদের পরে আমি অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি"। (সূরা আম্বিয়া: ১১) ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ যখন তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে চান, তখন তার জন্য কিছু উপকরণ তৈরী করে দেন, যার ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা ও বিলুপ্ত করা আবশ্যক হয়ে যায়। তাদের কুফরের পর সবচেয়ে বড় উপকরণটি হচ্ছে: তাদের জুলুম-অত্যাচার, বাড়াবাড়ি এবং আল্লাহর বন্ধুদেরকে কষ্ট দেয়ার বিষয়ে সীমালঙ্ঘণ, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যাযজ্ঞ ও তাদের উপর কর্তৃত্ব করা'।

আল্লাহ তাঁর কিতাব কুরআনে অত্যাচারীদের কথা এবং তাদের খারাপ পরিণামের বিষয় উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বানিয়েছেন। যেমন ফেরাউন সীমালঙ্ঘণ করেছে এবং পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়েছে। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِيَعٗا يَسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةٗ مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَيَسۡتَحۡيِۦ نِسَآءَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾

“বস্তুতঃ ফেরাউন দেশে উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল আর সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে দুর্বল করে রেখেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; সে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী”। (সূরা কাসাস: ৪) বরং সে পালনকর্তা আল্লাহকেও ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং তাকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾

“সে বলল, ‘আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব”। (সূরা নাযিয়াত: ২৪) তার সম্মুখে নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে দেখে গর্ব করেছে। সে বলতো:

﴿أَلَيۡسَ لِي مُلۡكُ مِصۡرَ وَهَٰذِهِ ٱلۡأَنۡهَٰرُ تَجۡرِي مِن تَحۡتِيٓۖ﴾

“মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদনদী আমার নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে”? (সূরা যুখরুফ: ৫১)

আল্লাহ তার জন্য ওঁত পেতে আছেন, তাকে ছাড় দিয়ে রাখেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। তাই তার উপর পানি প্রবাহিত করেছেন এবং তাতে ডুবিয়ে মেরেছেন। তার মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে বলেছেন,

﴿فَٱلۡيَوۡمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايَةٗۚ﴾

“আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।” (সূরা ইউনুস: ৯২) তিনি জানিয়েছেন যে, তার মৃত্যুর সময় সাগরের ঢেউয়ের তরঙ্গমালা যখন তার উপর আছড়ে পড়ছিল, তা ছিল একটি ভয়ঙ্কর বিষয়। আল্লাহ বলেন,

﴿فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلۡأٓخِرَةِ وَٱلۡأُولَىٰٓ ٢٥ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰٓ﴾

“পরিশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার ‘আযাবে পাকড়াও করলেন। যে ভয় করে এমন প্রতিটি লোকের জন্য এতে অবশ্যই শিক্ষা আছে”। (সূরা নাযিয়াত: ২৬)

শুআইব (আ.) তার সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন এবং মানুষের উপর জুলুম করতে তাদেরকে নিষেধ করেছেন। তাদেরকে বলেছেন,

﴿أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾

“তোমরা মাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণ করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না, আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না”। (সূরা হূদ: ৮৫) তখন তারা তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছিল। তারা বলল,

﴿أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُاْۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلۡحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ﴾

“তোমার ইবাদত কি তোমাকে এই হুকুম দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষ যার ইবাদাত করত আমরা তা পরিত্যাগ করি বা আমাদের

ধন-সম্পদের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছে (মাফিক ব্যয় করা) বর্জন করি, তুমি তো দেখছি বড়ই ধৈর্যশীল, ভাল মানুষ”। (সূরা হূদ: ৮৭) ফলে আল্লাহ তাদের উপর আগুন প্রেরণ করলেন, যা তাদেরকে পুড়িয়ে ধ্বংস করল এবং অত্যাচার করে যে সম্পদ অর্জন করেছিল সেগুলোও জ্বালিয়ে শেষ করলো। আল্লাহ বলেন,

﴿فَأَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّلَّةِۚ﴾

“ফলে তাদেরকে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি পাকড়াও করল”। (সূরা শুআরা: ১৮৯) অর্থাৎ আকাশ থেকে আগত একটি আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দিল। তাই আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ﴾

“তা ছিল এক মহা দিবসের ‘আযাব”। (সূরা শুআরা: ১৮৯)

ছামূদ জাতি শিরকের সাথে আরো যে অপরাধটি করেছিল তা ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন স্বরূপ প্রেরিত পশু (উটনী)কে হত্যা করা। ফলে তিনি তাদের উপর এমন বিকট শব্দ প্রেরণ করেন, যা তাদের অন্তরাত্মাকে ফাটিয়ে দিয়েছিল। শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়কে লঙ্ঘণ করবে, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে তুচ্ছ মনে করবে, তাঁর বান্দাদেরকে হত্যা করবে ও তাদের রক্ত প্রবাহিত করবে, সে তাদের চেয়ে অধিক শাস্তির সম্মুখীন হবে’।

আর মুমিনদের উপর যদি কষ্ট, বিপদ, যন্ত্রণা ও সমস্যা নেমে আসে, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাঁর নির্ধারণে দয়ালু, পরিচালনায় মহাবিজ্ঞ, তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর হিকমতে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি বলেন,

﴿ذَٰلِكَ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖۗ﴾

“এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান”। (সূরা মুহাম্মাদ: ৪) তিনি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শক্তিশালী প্রতিহতকারী। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ মু’মিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন”। (সূরা হাজ্জ: ৩৮) ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, অর্থাৎ- তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি তাদের পক্ষ সমর্থন করে খারাপ লোকদের অনিষ্ট ও পাপী লোকদের ষড়যন্ত্র থকে তাদেরকে রক্ষা করে থাকেন। তিনি তাদেরকে হেফাযত করেন, রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন’। এই প্রতিহতকরণ বান্দার ঈমান ও তাঁর সাথে তার সম্পর্ক অনুযায়ী হয়ে থাকে। যার ঈমান বেশী হয়, তার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতিরোধ শক্তিশালী হয়। কাতাদা (রহ.) বলেন, “আল্লাহর কসম! যে লোক আল্লাহর দ্বীনকে হেফাযত করে, তিনি তাকে কখনো নষ্ট হতে দিবেন না’।

একজন মুসলিম বিজয় লাভের উপকরণ গ্রহণ করবে। আল্লাহর উপর সুধারণার ভিত্তিতে জুলুম ও বল প্রয়োগকে প্রতিহত করবে যে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। তাঁর নাম ও গুণাবলী থেকে যে শক্তি, ক্ষমতা, মহত্ত্ব ও সম্মানের প্রমাণ পাওয়া যায় তার প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং মুমিনদের সাহায্য করার বিষয়ে আল্লাহর যে ওয়াদা কুরআনে এসেছে তার প্রতি ঈমান রাখবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

“মু’মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব”। (সূরা রূম: ৪৭) অনেক বেশী তাঁর ইবাদত করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তাঁর পথে ফিরে আসবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾

“তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, (অর্থাৎ আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে নাও) তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তোমাদের পাগুলোকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন”। (সূরা মুহাম্মাদ: ৭) সেই সাথে আত্মবিশ্বাস রাখবে যে স্বস্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ﴾

“জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী”। (সূরা বাকারা: ২১৪)

এই দৃঢ় ইয়াকীন রাখবে যে, আল্লাহর উপর ভরসাই হচ্ছে বিজয়ের মূল ভিত্তি। আল্লাহ বলেন,

﴿إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ وَإِن يَخۡذُلۡكُمۡ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعۡدِهِۦۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾

“যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না এবং যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, সে অবস্থায় এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মু’মিনদের আল্লাহর প্রতি নির্ভর করাই উচিত”। (সূরা আল ইমরান: ১৬০)

সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকলে এবং দ্বন্দ্ব-বিরোধ বর্জন করলে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ﴾

“পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে”। (সূরা আনফাল: ৪৬) সবর হচ্ছে কষ্ট লাঘবের চাবি। বিপদ ও পরীক্ষার সময় সবর আবশ্যক হয়ে যায়। শত্রুর বিরুদ্ধে দুয়া হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম) বলেন, “মাযলুমের বদদুয়াকে ভয় কর, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই”। (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে আকীল (রহ.) বলেন, ‘মজলুমের দুয়া দ্রুত কবুল হয়’।

উত্তম কথার মাধ্যমে শুভ লক্ষণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম)এর হেদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে, তাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে, আহত করা হয়েছে, কষ্ট দেয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কৌশল ও ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং নিজের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাদু করা হয়েছে। তার জীবদ্দশায় নিজের ছয়জন সন্তান মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি বলতেন,

“ফাল ও সুলক্ষণ আমাকে আনন্দ দেয়। তখন বলা হল, ফাল কী? তিনি বললেন, উত্তম কথা”। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম আল্লাহর সাহায্যের বিষয়ে দৃঢ় ইয়াকীন রাখবে। অত্যাচারীদের উপর আস্থা রাখা তার জন্য হারাম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

“তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, আর তখন আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাদের অভিভাবক থাকবে না, অত:পর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না”। (সূরা হূদ: ১১৩)

আল্লাহ তাঁর ক্ষমতাবলে দুর্বলকে সাহায্য করে থাকেন, যদিও বিপদাপদ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে পরিত্যাগ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾

"আল্লাহ তাঁর কাজের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ লোকই (তা) জানে না"। (সূরা ইউসুফ: ২১) মুমিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য তো শুধু আসে ঈমান ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। তাঁর বান্দাদেরকে তিনি সাহায্যকারী যদিও তাদের সংখ্যা কম ও প্রস্তুতি অল্প থাকে। কেননা সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি বলেন,

﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةَۢ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ﴾

"আল্লাহর হুকুমে বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে"। (সূরা বাকারা: ২৪৯)

তিনিই মহান আল্লাহ, যুদ্ধ ছাড়াই কখনো বান্দাদেরকে বিজয় দিয়ে থাকেন। যেমন তিনি আহযাবের (খন্দক) যুদ্ধে করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيۡظِهِمۡ لَمۡ يَنَالُواْ خَيۡرٗاۚ
وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزٗا﴾

"আর আল্লাহ কাফিরদেরকে তাদের রাগের অবস্থাতেই ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী"। (সূরা আহযাব: ২৫) আবার অনেক সময় শত্রুর অন্তরে ভয় ঢেলে দিয়ে তাদেরকে বিজয় দিয়ে থাকেন। যেমন ইহুদীদের বানী নাযির গোত্রের বিরুদ্ধে হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

﴿مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ﴾

“তোমরা ধারণাও করনি যে, তারা তাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবে। আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর আযাব এমন এক দিক থেকে আসল যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং তিনি তাদের অন্তরসমূহে ত্রাসের সঞ্চার করলেন”। (সূরা হাশর: ২) অনেক সময় সীমালঙ্ঘণকারীদের ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে বাহিনী প্রেরণ করেন। কা’বা ঘর ধ্বংসের জন্য আবরাহা ইয়ামান থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী হস্তি বাহিনী সাথে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য সবচেয়ে দূর্বল প্রাণী পাখি তাদের উপর নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

যদিও কখনো মুসলিমদের মধ্যে হতাহতের ঘটনা ঘটে- যেমন উহুদ প্রান্তরে হয়েছিল- তবু শেষ (উত্তম) পরিণাম তাদেরই জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন,

﴿فَٱصۡبِرۡۖ إِنَّ ٱلۡعَٰقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَ﴾

“কাজেই ধৈর্য ধর, শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট”। (সূরা হূদ: ৪৯)

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

যদিও কখনো কখনো মুসলিমদেরকে ব্যর্থ করা হয়, কিন্তু মূলত তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়, তবু তারাই বিজয়ী। যদিও তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়, তবু তারাই সাহায্য প্রাপ্ত।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে কেউ পরিত্যক্ত হয় না, আর তাঁর স্মরণাপন্ন হলে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম

﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ﴾

"জমিনে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছে করলাম, আর তাদেরকে নেতা ও উত্তরাধিকারী করার (ইচ্ছে করলাম)। আর (ইচ্ছে করলাম) তাদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য বাহিনীকে দেখিয়ে দিতে যা তারা তাদের থেকে আশঙ্কা করত"। (সূরা কাসাস: ৫-৬)

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল আযীমের মধ্যে বরকত দান করুন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد للَّه على إحسانِه، والشُّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنِه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

হে মুসলিমগণ!

ইতিহাস বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ও উপদেশে ভরপুর। বিভিন্ন ঘটনাবলী ও কাহিনীতে ভর্তি। পূর্ববর্তী জাতির অবস্থা এবং অত্যাচার ও অত্যাচারীদের পরিণাম সম্পর্কে জানার মধ্যে রয়েছে বিবেকবানদের জন্য উপদেশ। যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে সেই প্রকৃত ভাগ্যবান।

সীমালঙ্ঘণকারীদের জীবন কাহিনী, জালেমদের শাস্তি এবং অপরাধীদের পরিণতিতে আছে শিক্ষা তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে, তিনিই সকল কিছুর উপর মহাক্ষমতাবান। আল্লাহ বলেন,

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

“ওদের প্রত্যেককেই আমি তার পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কারো প্রতি আমি পাঠিয়েছিলাম পাথরসহ ঝটিকা, কারো প্রতি আঘাত হেনেছিল বজ্রের প্রচন্ড আওয়াজ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছি ভূগর্ভে আর কাউকে দিয়েছিলাম ডুবিয়ে। তাদের প্রতি আল্লাহ কোন যুলম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল”। (সূরা আনকাবূত: ৪০)

সময় যত দীর্ঘ হোক প্রত্যেক জুলুমের একটি শেষ আছে। ধৈর্যের সাথেই আছে বিজয়। বিপদের সাথেই আছে মুক্তি। কঠিন অবস্থার পরেই আছে সহজতার সুসংবাদ।

﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا﴾

"অত:পর কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে"। (সূরা ইনশিরাহ: ৫-৬)

অতঃপর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে।...

সূচীপত্র

ভূমিকা ৫
প্রশংসিত শিষ্টাচারসমূহ 7
জিহ্বার সংরক্ষণ ৮
সততা ২৫
দ্বিতীয় খুতবা ৩৫
কৃতজ্ঞতা ৩৮
উত্তম চরিত্র ৫৩
সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা ৬০
উদারতা-দানশীলতা ৭০
অনুগ্রহের স্বীকৃতি ৮০
দয়া-করুণা ৯১
লজ্জাশীলতা কল্যাণকর ১০৬
নিন্দনীয় আচরণসমূহ 119
অহংকার ১২০
হিংসা ১৩৫
জুলুম ১৪৮

জালেমের পরিণাম ১৬২

সূচীপত্র ১৭৭

‘তালিবুল ইল্‌ম’ প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা
০০৯৯৬৫০৬০৯০৪৪৮

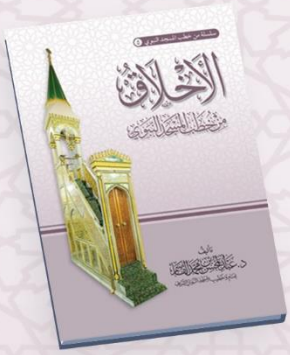

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

"মসজিদে নববীর খুতবার সিরিজ"

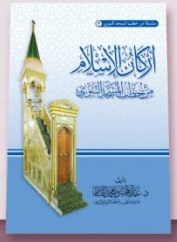

আরকানুল ইসলাম

কিতাবুত তাওহীদ

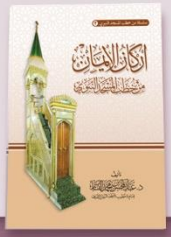

আরকানুল ঈমান

নবী সাঃও তার সাহাবীগণ